গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

GANATANTRA EKTI KUFRI MOTOBAD

WRITTEN BY: MUHAMMAD ABDUL ALIM

প্রকাশনায়ঃ
হানাফী ফাউন্ডেশন
প্রকাশক
হাফিজ মুহাম্মাদ ওবাইদুল্লাহ
ইলামবাজার, বাগোলবাটী, বীরভূম
মোবাইলঃ+৯১ ৯৭৩৪২০১০১২

উৎসর্গ
ফারহান আখতার আল নুমান এর উদ্দেশ্যে

প্রকাশকালঃ ১৫ মে ২০১৬

মূল্যঃ ৮০ টাকা মাত্র

Ganatantra Ekti Kufri Motobad, Written By Muhammad Abdul Alim, 1st Edition 15 May 2016, Published by Hanafi Foundation, Ilambazar, Bagolbati, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs. 80/- (Eighty Rupise Only)

সূচীপত্র

ভুমিকা

সমস্ত প্রসংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য। তাঁর প্রিয় হাবীব তাজেদারে মদীনা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম; যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়েদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনেবিন।

'গণতন্ত্র'। গণতন্ত্র এমন একটি মতবাদ যা সর্বকালের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার এবং গবেষনার বিষয়। গণতন্ত্রকে বহু বুদ্ধিজীবি সমর্থন করেছেন এবং অনেকে এর প্রতিবাদও করেছেন। সমর্থনকারীদের দৃষ্টিতে 'গণতন্ত্র'ই হল এমন একটি মতবাদ যা দেশের জন্য মঙ্গলদায়ক এবং বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে 'গণতন্ত্র' হল এমন একটি যন্ত্র যার সাহয্যে জনগণকে নির্মমভাবে শোষন করা হয়।

অনেকে মনে করেন গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এটা একটি মারাত্মক ভূল ধারণা। কেননা বর্তমান গণতন্ত্রের জনক হলেন প্রাক্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। গণতন্ত্রের এই কথিত জনক তাঁর জীবনীতে লিখেছেন, তিনি তাঁর মাতাপিতার অবৈধ সন্তান। তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর মা ছিল ইহুদী এবং পিতা ছিল খ্রীষ্টান। তিনি এও লিখেছেন যে তাঁর মাও ছিল অবৈধ তথা জারজ সন্তান। আর অবৈধ এ জাতের প্রোডাকশন হচ্ছে গণতন্ত্র তথা জুলুমতন্ত্র। তাহলে গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে বিরোধ নেই কেন? বাস্তবে গণতন্ত্র ও ইসলাম দুটি বিপরীত নেরু। ইসলামে যদি সামান্যও গণতন্ত্র বাকি থাকে তাহলে সেটা ইহুদী ও খ্রীষ্টানের জারজ সন্তান আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রবর্তিত গণতন্ত্র নয়।

গণতন্ত্র যে ইসলামবিরোধী ও বাস্তববিরোধী মতবাদ তা প্রমাণ করতেই আমার এই পুস্তক প্রনয়ণ। পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তাই এই পুস্তকের মধ্যে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন । তাহলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোণ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে পাঠকদের জানাই, আপনারা দোয়া করবেন; আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খায়ের দান করেন। (গ্রন্থাকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

শালজোড়, বীরভূম (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

মোবাইলঃ +৯১ ৮৯২৬১৯৯৪১০

হুয়াটস এ্যপঃ +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

E-Mail :- md.abdulalim1988@gmail.com

গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ

জীবন যেমন সত্য, তেমনি জীবনের জন্য একটি জীবন বিধান থাকাও অপরিহার্য। সাধারণ জনগণের এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে থাকুক কিংবা না চিন্তাশীল বোদ্ধামাত্রই এর গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। প্রশ্ন হচ্ছে জীবন বিধান আসবে কোত্থেকে? কে দেবেন জীবন পরিচালনার এই বিধান? এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে অনেকেই আরেক কদম অগ্রসর হয়ে নিজেরাই জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। নিজের অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষের সমস্যা গুলোর প্রকৃতি ও ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন, এর কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এবং এর আলোকে তার স্বকল্পিত সমাধান পেশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে আরেকদল পণ্ডিত এসে কেউ এর পক্ষ সমর্থন করেছেন আবার কেউবা সম্পূর্ণ নতুন করে থিসিস দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু জীবনদাতাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনভাবে জীবন বিধান অনুসন্ধান করা যেমন বোকামী; তেমনি অপরিণামদর্শিতাও। এই অপরিণামদর্শিতার কবলেই গোটা মানবতা আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। দিগেদিক ছুটাছুটি করছে। জন্ম নিচ্ছে নানান মত, পথ, মতবাদ। মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও অনুবাধন ক্ষমতা যেহেতু সীমাবদ্ধ তাই মানুষের জীবনরে সমস্যার সমাধানে তার উদ্ভাবিত পথ-মতবাদ স্বাভাবিক ভাবেই সার্বজনীন ও কালোর্ত্তীণ হতে পারে না। এজন্যই দেখা যায় গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য আজও কোন একক মতবাদকে অনুসরণের আদর্শ হিসেবে কেউ পেশ করতে পারেনি। পৃথিবীর একেক জনপদের মানুষ তাই তাদের সুবিধামতো একেকটা মতবাদের গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমস্যা অনেক। একই দেশে আবার একটা মত বেশিদিন টিকে থাকে না, টিকতে পারে না। সময়ে একবার এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এর স্থলে নতুন আরেক চিন্তার উদ্ভব ঘটে এবং সেটিই তখন পূর্ণ আধিপত্য নিয়ে জনগণকে আশার ঝলকানি দেখায়। এক সময় এরও আধিপত্য এবং প্রয়োজনিয়তা ফুরিয়ে যায়। তখন পরবর্তী প্রজন্ম তাকে প্রত্যাখান করে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির বিচারে পূর্ববর্তীদের সমালোচনা করে। এভাবেই মানবতা খণ্ডিত হচ্ছে এবং একই দেশে বিভিন্ন ধারার মতবাদের উদ্ভব ঘটছে। মানুষ একটাকে ছেড়ে যখন আরেকটা গ্রহণ করে তখন বুঝা যায়, প্রচলিক

ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি ঘটেনি। এভাবেই হাজার বছর ধরে প্রয়াস চালিয়েও মানুষ মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পায়নি। কেনো পায়নি তার কারণ অনেক। মানুষ যেহেতু মানুষের জীবনদাতা নয়, তাই মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত জীবনাদর্শ মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন হতে পারে না। কোনো একটি মতবাদ কোনো একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ প্রয়োজন পুরণ করলেও তা আবার জন্ম দেয় একই সাথে আরো অনেক সমস্যার। অন্য আরেকটা অধিকতর সাবলীল মতবাদের খোঁজ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা তুলনামূলক বিকল্প মেনে নিতান্ত বাধ্য হয়েই সমস্যা জর্জর মতবাদটিকে আপাততঃ সমাধান রূপে মেনে চলে। কিন্তু এতে সমাধানের পরিবর্তে বরং বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয় বেশি। কথায় বলে ‘কুইনাইন জ্বর সারায় বটে, কিন্তু কুইনাইন সারবে কে?’ এই একই প্রশ্ন বর্তমান প্রচলিত মানব রচিত মতবাদগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ‘তাদের চেয়ে বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়েত-জীবন বিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের নফসের দাসত্ব এবং মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করে চলে’। (কাসাস-৫০)

অন্যত্র বলা জহয়েছে ৮ ‘আমার নিকট থেকে যখন হেদায়েত আসবে তখন যে লোকই আমার হেদায়ত মেনে চলবে, সে কখনো গুমরাহ হবে না, ভাগ্যাহত অগ্রাহ্য করবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণতার চাপে আক্রান্ত’। (তাহা-১২৩-১২৪)

আল্লাহর দেয়া বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষ যেই মনগড়া পথে চলা শুরু করেছে তখনই মানব সভ্যতা বিপর্যয় ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়েছে। এটা মানুষ হিসেবহে মানবতার জন্য যেমন বিপর্যয়কর তেমনি একজন ঈমানদারের ঈমানের প্রতিও এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। এ ধরণের অসংখ্যা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আজ আমরা। গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ধরণেরই একটি নতুন ধারণা। আজ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের দাপট জয়জয়কার। এটি এখন একটি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। আমরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলছি। পুঁজিবাদের সমালোচনা করছি। কিন্তু গণতন্ত্রকে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করছি। অথচ এর আভ্যন্তরীণ বৈপররীত্য এবং ইসলামের সাথে এর কোন

বৈসাদৃশ্য আছে কিনা তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি না। বিষয়টি তাই একটু বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

গণতান্ত্রিক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আজকের পৃথিবীর একটি সর্বাধিক আলোচিত শ্লোগান। এই বাক্য অনেকটা সোনার হরিণের মতো। পৃথিবী ব্যাপি এই গণতন্ত্রকে পাওয়ার জন্য যুদ্ধ, সংগ্রাম, মিছিল, মিটিং, ক্যু, পাল্টা ক্যু, জ্বালাও-পুড়াও কতকিছু হয়। কিন্তু কোথাও তা পাওয়ার সংবাদ আজো কেউ দিতে পারেনি। ক্ষমতার মসনদের ছোঁয়ায় কেউ কেউ পেয়েছি পেয়েছি বলে চিৎকার করেন; কিন্তু সোনার হরিণটি কেউ জনগণের সামনে দাঁড় করাতে পেরেছেন কি? তা হলে দেখা যাক গণতন্ত্র জিনিষটা কি? গণতন্ত্র মূলত এসেছে ইংরেজী Democracy শব্দ থেকে। Democracy শব্দটি এসেছে গ্রীক ‘ডিমোস’ (Deimos) এবং ‘ক্রেটিয়া’ (Kratia) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে। ‘ডিমোস’ (Deimos) শব্দের অর্থ জনগণ (People), আর ‘ক্রেটিয়া’ (Kratia) অর্থ শাসন। এ থেকেই Democracy কে বাংলায় নাম দেয়া হয়েছে গণতন্ত্র। গণ অর্থ জনগণ। তন্ত্র অর্থ নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক শাসন বলতে বুঝানো হয় জনগণের নিয়ম কানুন বা পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা বা সরকার পরিচালনাকে। গণতন্ত্রের জন্ম গ্রীসে, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের প্রচার-প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন দেশে। মানুষের একটি স্বভাবজাত অভ্যাস হলো তার সামনে যা নিয়ে আসা হয় তা কেউ না কেউ গ্রহন করবে; তা মদ-গাজা-ড্রাগ হোক আর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হোক। দর্শনের ক্ষেত্রেও তাই। ১৬-১৭ খ্রিস্টীয়শতকে পাশ্চাত্য জগতের দার্শনিক মহলে গণতন্ত্রের জাগরণ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দার্শনিক এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। পাশ্চাত্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তখন চলতো খ্রিস্টান ধর্মগুরু পাদ্রীদের শাসন। রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাদ্রীরা বিভিন্ন বিধান তৈরি করে ঈশ্বরের আইন বলে প্রচার করতেন। বাস্তবে খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের কোন দিক নির্দেশনা নেই। ফলে খ্রিস্টান সমাজের দার্শনিকদের ভেতর মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ গ্রীক সমাজ থেকে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রকে সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। আবার কেউ কেউ

রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাব মুক্ত করার ঘোষণাও করেন। যেমন- দার্শনিক মাকিয়াভেলি স্পষ্ট ঘোষণা করেন, 'রাষ্ট্রের প্রশ্নটি বিচার করা হবে ঈশ্বরতাত্ত্বিক নয়, ঐহিক অবস্থান থেকে।'

১৬-১৭ খ্রিস্টশতকে নেদারল্যান্ডসে সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে দেশের নিম্নশ্রেণী থেকে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই বিদ্রোহের চূড়ায় নেতৃত্ব পর্যায়ে ছিলেন **'হ. গ্রটিস'** এবং **'ব. সিপনোহ'**র নামী দুই দার্শনিক। নেদারল্যান্ডসের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ওদের অবদান প্রচুর রয়েছে। স্টুয়ার্ট রাজ বংশের সাথে বৃটিশ পার্লামেন্টের তীব্র সংঘর্ষ চলাকালিন সময় দার্শনিক টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) এর আবির্ভাব। তখন রাজপক্ষ আর পার্লামেন্ট পক্ষের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থান দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের অনেক পরও এই সংঘর্ষ অব্যাহত ছিলো। দার্শনিক টমাস হবস ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) বস্তুবাদী দর্শনের বিশ্বাসী। হবসকে বলা হয় আধুনিককালের প্রথম লেখক, যিনি স্বাভাবিক বিধির ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিষয়ে একটি মতবাদ বিকশিত করেন। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'লেভিয়াথান'। গ্রন্থখানি চার অধ্যায়ে বিভক্ত; যেমন মানুষ, রাষ্ট্র, খ্রিস্টীয় রাষ্ট্র এবং তমসার রাজ্য। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা তিন ধরনের বলেছেন: গণতান্ত্রিক, আভিজাতিক, রাজতান্ত্রিক। তাঁর মতে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং আভিজাতিক রাষ্ট্রের ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস জনগণ। রাজতন্ত্রে জনগণ তার হুকুম খাটায় এবং ইচ্ছার প্রকাশ করে এক ব্যক্তি 'রাজা'র মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক ও আভিজাতিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা দলবদ্ধ আর তাদের সভাই হলো জনগণ। গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকদের সভা, পরিষদ, বহু বা এক ব্যক্তি জনগণ৷ আর রাজতন্ত্রে রাজাই জনগণ। দার্শনিক টমাস হবস-এর সময় যেহেতু স্টুয়ার্ট রাজবংশের সাথে বৃটিশ পার্লামেন্টের সংঘর্ষ চলছিলো তাই স্বাভাবিক কারণে তখন এই সংঘর্ষের প্রভাব তার মধ্যেও ছিলো। তিনির ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট যে, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং আভিজাতিক শাসনের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই। যারা গণতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে রাজতন্ত্র ও আভিজাতিক শাসনকে স্বৈরতন্ত্র বলে থাকেন ওদের বিরুদ্ধে তিনি বিরূপ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে 'গণতন্ত্রের সব কিছুই নির্ধারিত হয় সংখ্যাধিক্যে। আর সংখ্যাধিকেরা ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞানী। তাই

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত হয় ভুল। তিনি আরো বলেন গণতান্ত্রিক বিধান সভায় সংখ্যাধিক্য ঘটে কখনো এক পার্টির, কখনো অন্য পার্টির। ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার মতো আইন এক্ষেত্রে এক দিক থেকে অন্য দিকে যায়।' (হবস নির্বাচিত রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

দার্শনিক টমাস হবসের রচনাবলি থেকে আমরা গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং ভালো মন্দের দিক মোটামুটি বুঝতে পারি। সাথে আমরা একথাও জানতে পারি যে, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং আভিজাতিক শাসনের মধ্যে তেমন কেনো ব্যবধান নেই। স্ট্যুয়ার্ট রাজবংশের সাথে বৃটিশ পার্লামেন্টের সংঘর্ষের সময় রাজবংশের নিরংকুশ ক্ষমতার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে দার্শনিক জনলক-এর জন্ম। লন্ডনের ওয়েষ্ট মিনিস্টার গির্জার স্কুল থেকে তার শিক্ষা জীবন শরু। ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সেখানে প্রথমে শিক্ষাজীবন শেষ করেন এবং পরে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছাত্র এবং শিক্ষক অবস্থায় মোট ৩২ বছর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক কারণে সেখান থেকে চলে আসেন। 'রাষ্ট্র শাসন' এবং 'মানবিক সুবুদ্ধির অভিজ্ঞতা' নামে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জনলকের দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে জনলক মারা যান।

জনলক রাষ্ট্ররূপের শ্রেণীভেদে মেনে নিয়েছিলেন প্রাচীন গ্রীসের প্রখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের (খ্রিঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২ অব্দ) ত্রিধারা। তিনি রাষ্ট্রকে তিন ভাগে ভাগ করে দেন গণতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, রাজতন্ত্র। তাঁর মতে, 'রাজতন্ত্র হতে পারে নির্বাচনমূলক অথবা উত্তরাধিকারভিত্তিক। মাঝামাঝিও হতে পারে'। তিনি এই তিন ধরনের রাষ্ট্রকে স্থাপন করেছেন 'সম্মতি সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে'। তাঁর মতে, 'রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব হয় সমাজের অবস্থা থেকে; যা নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে'। রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'কেউ কেউ মনে করেন দুনিয়ার শাসনের একমাত্র রূপ নিরংকুশ রাজতন্ত্র, তা আসলে নাগরিক সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সুতরাং কোনক্রমেই তা নাগরিক শাসনের রূপ হতে পারে না'। আবার তিনি এ কথাও বলেছেন যে 'ক্ষমতার সীমাবদ্ধ ও স্বাভাবিক বিধির সঙ্গে রাষ্ট্রের সঙ্গতি থাকলে বংশগত রাজক্ষমতাতেও আপত্তি

নেই’। তবে রাজ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন; তাকে গণ্য করা উচিৎ তার আইনে ঘোষিত সামাজিক ইচ্ছায় চালিত রাষ্ট্রের রূপক, ছায়ামূর্তি বা প্রতিনিধি বলে। সুতরাং আইন বলে যা প্রদত্ত তা ছাড়া তার কোন মর্জি বা ক্ষমতা নেই।’ (জনলক, নির্বাচিত দার্শনিক রচনাবলি, ২য় খণ্ড) জনলককে পাশ্চাত্য বিশ্বে আধুনিক রাজনৈতিক দার্শনিকদের একজন মনে করা হয়। বিশেষ করে যে সব ঘটনার মধ্যদিয়ে আধুনিক বৃটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত পত্তন হয় তিনি ছিলেন তার অংশী। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে ওলট-পালটের মধ্যদিয়ে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় জনলক হলেন এর তাত্ত্বিক। এই ওলট-পালটকে ইতিহাসে ‘গৌববোজ্জ্বল বিপ্লব’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আজকের ব্রিটেনে যে রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শাসন চলছে তা সেই বিপ্লবের-ই ফসল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত জনলক হলেন ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক শাসক মহলের স্বীকৃত ভাবগুরু। আমেরিকার বিশিষ্ট গবেষক ‘জনডান’ তাঁর গ্রন্থে জনলক সম্পর্কে বলেন ‘তার তত্ত ছিলো এতটাই রক্ষণশীল যে ইংরেজ অভিজাত ও বৃদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে তাকে আঠারো শতকের ইংল্যান্ডের আত্মবদ্ধ গোষ্ঠী বিভক্ত সমাজের পক্ষে সন্তোষজনক ভাবাদর্শ বলে গ্রহণ করে।’

জনলকের দর্শনের প্রভাব আটারো শতকের দিকে শুধু ইংল্যান্ডেই নয়; ফ্রান্স, হল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিস্তার লাভ করে। আমেরিকান বিপ্লবের ভাবদর্শন জনলকের দর্শনের এতই নিকটে যে অনেক গবেষক মত প্রকাশ করেছেন যে শিক্ষিত আমেরিকানদের অধিকাংশ তাদের রাজনৈতিক ধারনা পেয়েছেন সরাসরি রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে জনলকের দর্শন থেকে’। জনলক বিভিন্ন শাসন পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এর সমাধান তিনি দিয়ে যাননি কিংবা দিয়ে যেতে পারেননি। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র না অন্য কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ? সেদিকে তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। তিনি রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র উভয়টাকে কিছু শর্তের ভেতর উত্তম বলেছেন। সাথে সাথে তাও বলেছেন ‘সমাজের ইচ্ছাক্রমে শাসনের রূপ বদলাতে পারে’। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্রের রূপান্তরের সর্বাধিক পূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সতোরোশতকে। ইংল্যান্ডের তৎকালীন পুঁজিবাদী জমিদার গোষ্ঠী

ছিলো দ্রুত বস্তু শিল্পের আগ্রহী। তারা সাধারণ কৃষকদেরকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে জমিগুলোকে মেষচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। যা আজো আছে। বর্তমান ইংল্যান্ডে দেখা যায় বিরাট বিরাট অঞ্চল নিয়ে ফার্মারগণ বসে আছেন। এক সময় ইংল্যান্ডে ছোট ছোট অনেক ফার্ম ছিলো, কিন্তু সরকারের পূঁজিবাদীনীতির কারণে আজ এগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় অল্প পূঁজির কৃষকদের পূঁজি নিয়োগের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তব প্রেক্ষাপটে এবং ইতিহাস পর্যালোচনায় একথা বলা যায় যে, সতেরো শতকের মাঝামাঝি বিপ্লবের বিজয় ছিলো পূঁজিবাদের দ্রুত বৃদ্ধির নির্ধারক শর্ত। ইংল্যান্ডে সেই বিপ্লবের প্রস্তুতিক্রমে এবং বিপ্লবের গতিপথে, পরবর্তীতে দেশের পূঁজিবাদী নীতি বিকাশের প্রক্রিয়ায় যে রাজনৈতিক তত্ত দেখা দেয় তা গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, সামাজিক চুক্তি এবং ব্যক্তির সমাধিকার বিষয়ে জনলকের দর্শন অনুযায়ী যে সব ভাবনা বিকাশ পেতে থাকে তা অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির চিন্তায় এবং ইউরোপ-আমেরিকায় গণতান্ত্রিক প্রস্তুতিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। সেই সময় অসংখ্য যুদ্ধ, রক্তপাত এবং ফাকি-মেকির মাধ্যমে বিশাল ঔপনিবেশিক সম্পত্তি দখল করে ইংল্যান্ড ইতিহাসে নিষ্ঠুর উৎপীড়নের অধ্যায় সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশের সাধারণ জনগণ তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে। আমেরিকা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি অন্য কেউ প্রতিরোধ সংগ্রামে সাফল্য লাভ করেনি। আমাদের ভারতবর্ষেই দীর্ঘ দুই শত বছর ধারাবাহিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়। আমেরিকানরা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই তাদের স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনে। সেখানে গঠিত হয় প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্ট। সেই পার্লামেন্ট থেকে ঘোষণা দেয়া হয় 'জনগণই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর। লোকেরা সমাধিকারী, স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের অধিকার আছে জনগণের'। এই পার্লামেন্ট ইতিহাসের সর্বপ্রথম প্রতিনিধিত্বমূল গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট। অথচ যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আমেরিকার সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করে বিজয় অর্জন করলো তারাই বঞ্চিত হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিজস্ব ন্যায্য অধিকার থেকে। এখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ফল ও স্বাদ ভোগ করলো আমেরিকার বৃহৎবণিকশিল্পপতি আর দাস-প্রথাভিত্তিক আবাদমালিকেরা। আজও তারাই করছে। কারণ গণতন্ত্রে মানব সমস্যার মৌলিক সমাধান নেই। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবই সমগ্র ইউরোপের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঘাত হানে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন ফরাসী বিপ্লব সমস্ত ইউরোপকে আধুনিক যুগে উন্নীত করে। এই বিপ্লবের প্রেরণার উৎস ছিলো দার্শনিক, রাজনীতিবিদ,

সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনা ও তৎপরতা। ওরা সবাই ছিলেন গণতান্ত্রিক। ফরাসী বিপ্লব গণতান্ত্রিক ধারায় সংগঠিত হয় এবং তা ভোগ করে পূঁজিবাদী শ্রেণী। বিপ্লবের নেতৃত্ব নিয়ে পূঁজিবাদী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থপরতা পর্দার আড়ালে রেখে জনগণের নামে এগিয়ে এসেছিলো। ফরাসি বিপ্লবসহ সকল গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এমন স্ববিরোধীতার প্রতিফলন হর-হামেশা ঘটে। আটারো শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সে দানা বেঁধে উঠে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমি, তখন ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্ভরস্থল ছিলো যাজক ও অভিজাতদের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ অধিবাসী ছিলো তৃতীয় শ্রেণীর সম্প্রদায়। ওদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিলো না। বিভিন্নভাবে ওরা রাজতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক শোষণ-নির্যাতনের শিকার হতো। ওদের প্রায় সবাই ছিলো রাজতান্ত্রিক সরকার উচ্ছেদে আগ্রহী। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দার্শনিক শার্ল লুইমতেঁস্ক্য (১৬৮৯-১৭৭৫) এর দর্শনগত প্রভাব রয়েছে। তাঁর মতে একেকটা সমাজের অস্তিত্ব দাবি করে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যা এক সাধারণ শক্তিতে বিভিন্ন মিলনে নির্ধারিত। এই সাধারণ শক্তি থাকতে পারে এক বা বহু ব্যক্তির হাতে। এই দৃষ্টি থেকে তিন ধরনের শাসন ব্যবস্থার কথা তিনি বলেছেন। যথা প্রজাতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক। তিনি এই তিন পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার ব্যাখ্যায় বলেন 'আমি তিনটি সংজ্ঞা কিংবা বলা ভালো তিনটি ঘটনার উল্লেখ করছি-

১) যে শাসনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে সমগ্র জনগণ কিংবা তার অংশের হাতে, তাকে প্রজাতান্ত্রিক শাসন বলা হয়।

২) যাতে একজন লোক শাসন করে প্রতিষ্ঠিত এবং অপরিবর্তনীয় আইনের মাধ্যমে তাকে রাজতান্ত্রিক শাসন বলা হয়।

৩) যে শাসনে সব কিছু চলে আইন ও নিয়মের বাহিরে, একজন ব্যক্তির মর্জি ও স্বেচ্ছাচার অনুসারে তাকে স্বৈরাচারী শাসন বলা হয়।

প্রজাতান্ত্রিক শাসনকে আবার তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

১) গণতন্ত্র।

২) অভিজাততন্ত্র।

তাঁর মতে'প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যদি তাকে সমগ্র জনগণের অধিকারে তবে এটাকেও বলা হয় গণতন্ত্র। আর যদি তা জনগণের একাংশের হাতে থাকে তবে তা হয় অভিজাততন্ত্র'। মতেঁস্কো আরো বলেন হ'গণতন্ত্রে জনগণের খানিকটা নিজেরই এবং খানিকটা তাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'অছি', অর্থাৎ রাষ্ট্রের পদাধিকারীদের মারফত শাসন চালানো উচিত। গণতান্ত্রিকরাষ্ট্রে জনগণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ নির্বাচনে গঠিত সিনেট থাকা আবশ্যক। ... গণতন্ত্রে জনগণের বিভক্ত হওয়া উচিত শ্রেণীতে। এই দিয়েই নির্দিষ্ট হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো আইন প্রণয়নের বৈশিষ্ট্য, ভোটাধিকারী জনগণকে শ্রেণী বিভক্ত করাই হলো গণতন্ত্রের বুনিয়াদী আইন। তার আরেকটা বুনিয়াদী আইন হলো ভোটদানের পদ্ধতি। লটারী মারফত নিয়োগ গণতন্ত্রের প্রকৃতি। নির্বাচন মারফত নিয়োগ- অভিজাততন্ত্রের প্রকৃতি'। মতেঁস্ক্য ভোটদানের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- 'ভোটদানের পদ্ধতি নির্ণয়ে আইনও গণতন্ত্রের বুনিয়াদী আইনের অন্তর্ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে ভোট দান প্রকাশ্যে নাকি গোপনে হবে এ প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ... ভোট যখন জনগণ দেয় তখন নিঃসন্দেহে তা হওয়া উচিত প্রকাশ্যে। গণতন্ত্রের একটা মৌলিক আইন বলে এটাকে দেখা উচিত'। (মতেঁস্ক্য নির্বাচিত রচনাবলি, পৃঃ ১৬৯)

ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক ভাবনার প্রচারক হিসেবে জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) কে মনে করা হয়। জন্মসূত্রে তিনি সুইস হলেও ক্রিয়াকলাপে ঘনিষ্ঠভাবে ফ্রান্সের সাথে জড়িত ছিলেন। রুসোর

রাজনৈতিক দর্শন ১৮শতকের ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে বিপুল প্রভাব ফেলে ফ্রান্সের গণতান্ত্রিকমহলের সামাজিক চেতনায়। তাঁর প্রধান রাজনৈতিক রচনা 'সামাজিক চুক্তি বিষয়ে অথবা রাজনৈতিক অধিকার নীতি' । আটারোশতক থেকেই অনেক গবেষক রুসোকে নরমপন্থী নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী বলে উল্লেখ করেছেন । আবার অনেকে বলেছেন 'সর্বগ্রাসী গণতন্ত্র' তত্ত্বের স্রষ্টা। সামাজিক চুক্তিতে রুসো দিয়েছেন সমিতির এমন রূপের সন্ধান যা সমগ্র সাধারণ শক্তি দিয়ে সমিতির প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করবে এবং ঘিরে রাখবে। রুসো মনে করতেন 'সামাজিক চুক্তির ফলে চুক্তিবদ্ধদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তার বদলে সমিতির সবাই হয়ে দাঁড়ায় একক ব্যক্তিসত্তা। সমিতির বিধান হবে তৎক্ষণাৎ সভায় যতগুলি ভোট আছে ততগুলি সভ্য নিয়ে একটা নৈতিক ও যুথবদ্ধ সমগ্র গড়ে তুলবে। সেই সমগ্র হবে এমন যা এই বিধান মারফত পাবে তার ঐক্য, সাধারণ অহং, জীবন ও অভিপ্রায় । বাকি সমস্ত ব্যক্তির মিলনে গঠিত হবে সামাজিক ব্যক্তিসত্তা। আগে এর নাম ছিলো নাগরিক সমাজ। বর্তমানে তাকে বলা হয় প্রজাতন্ত্র বা রাজনৈতিক দেহ । যার সদস্যরা তার নাম দেয় রাষ্ট্র; যখন তা থাকে নিষ্ক্রিয় এবং সার্বভৌম । যখন তা হয় সক্রিয়; তার সদস্যদের সঙ্গে তুলনা করে শক্তি । অংশীদের ক্ষেত্রে যৌথভাবে তারা অভিহিত হয় জনগণ, আর আলাদা আলাদাভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অংশী হিসেবে অভিহিত হয় নাগরিক, রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনস্থ হিসেবে অভিহিত হয়-প্রজা।

চুক্তি সম্পাদনে যে নতুন অবস্থা দেখা দেয় রুসো তাকে বলেছেন নাগরিক অবস্থা । সার্বভৌমত্বকে তিনি বলেছেন সাধারণ অভিপ্রায়ের রূপায়ন। এ থেকে সাধারণভাবেই দেখা দেয় সার্বভৌমত্বের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক;

১) অবিভাজাত্যতা।

২) অনপসরণীয়তা।

রুসো লিখেছেন, 'আমি বলছি যে, সার্বভৌমত্ব হলো কেবল সাধারণ অভিপ্রায়ের রূপায়ন। তা কখনো হস্তান্তরিত হতে পারে না। যে সার্বভৌম যৌথ সত্তা ছাড়া কিছু নয়, তা নিজের প্রতিনিধি৷ হস্তান্তরিত হতে পারে ক্ষমতা কিন্তু অভিপ্রায় কোনো ক্রমেই নয়।' (রুসো, মস্কো/১৯৬৯। পৃঃ ১৭০) সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত হতে পারে না এই নীতিতে রুসো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে'সার্বভৌমত্ব নিহিত একমাত্র সাধারণ অভিপ্রায়ে। যার প্রতিনিধিত্ব চলে না। লোকসভার সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি হতে পারে না। তারা কেবল তার কর্মি, যারা চূড়ান্তরূপে কিছু স্থির করতে পারে না। জনগণ যদি সরকারি কোন আইন নিজেরা প্রবর্তিত না করে তবে তা বলবৎ নয়। আদপেই এটাকে আইন বলা যাবে না'। (প্রাগুক্ত পৃঃ ২৩)

সামাজিক চুক্তিতে রুসো দুই ধরনের রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন: প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ আইন শাসিত রাষ্ট্র। ধরে নেয়া হচ্ছে যে, আইন হলো সাধারণ অভিপ্রায়ের ফল। স্বৈরতন্ত্র, অর্থাৎ আইনের উর্ধ্বে অবস্থিত স্বৈর প্রভু শাসিত রাষ্ট্র। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, স্বৈরতন্ত্র অধঃপতিত রাষ্ট্র। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এই তিন ধরনের রাষ্ট্রকে রুসো শাসনের রূপ হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে এগুলো শুধু সরকার গঠনের অভিপ্রায়। সরকারের বৈশিষ্ট্য তিন ধরনের হতে পারেঃ

১) গণতান্ত্রিক সরকার: যা গঠিত হয় সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে।

২) অভিজাততান্ত্রিক সরকার: যা গঠিত হয় অল্পসংখ্যক নাগরিকদের নিয়ে।

৩) রাজতান্ত্রিক সরকার: যা গঠিত হয় একজন ব্যক্তিকে নিয়ে।

'গণতন্ত্র' কে এই অর্থে রুসো সোজাসুজি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরোধীতা করেছেন। তাঁর মতে, এইরূপ সরকারের রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব আর সরকার বিভক্ত নয়? তিনি আরো বলেন, শব্দটাকে

যদি তার যথার্থ অর্থে ধরি তাহলে সত্যিকার গণতন্ত্র কখনো ছিলো না, কখনো থাকবে না? (প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯২)

আধুনিক সময়ের মোড়ল হিসাবে আমরা পেয়েছি ইউরোপ-আমেরিকাকে। তারাই আবার গণতান্ত্রিক বিশ্বেরও মূড়ল বলে খ্যাত। আমেরিকার গণতান্ত্রিকতার ক্ল্যাসিক ছিলেন দার্শনিক টামাস জেফারসন; যার জন্ম ১৭৪৩ এবং মৃত্যু ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি আটারো শতকের আমেরিকান গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের তত্তাকার ও অন্যতম নেতা। তাঁর সময় থেকে 'শাসিতের ইচ্ছা অনুসারে শাসন' 'জনগণের শাসন' ইত্যাদি তত্ত আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে গণতন্ত্র বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের বিজয়ের পর স্থায়ী সংবিধান-আইনী কাঠামো গঠন পর্বে দার্শনিক জেফারসন ছিলেন পুরনো রাষ্ট্রীক প্রতিষ্ঠানের সুসংগত গণতান্ত্রিকরণ ও নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষপাতিদের নেতৃত্বে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে আটারো শতকের আমেরিকার বিপ্লব যেমন ছিলো গণতান্ত্রিক, তেমন ঔপনিবেশিকতা বিরোধীও। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি সতোরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ড অসংখ্য যুদ্ধ, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বিশাল ঔপনিবেশি সম্পত্তি দখল করে নিষ্ঠুর উৎপীড়নের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। এর বিরুদ্ধেই ছিলো আমেরিকানদের মূল আন্দোলন। আমেরিকান সমাজে গণতান্ত্রিক শক্তির রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির বিশেষ একটি কারণ ছিলো ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলন। বিজ্ঞদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আপোসমূলক চরিত্র ছিলো স্বকীয় ধরনের। মার্কিন রাষ্ট্রপাঠের স্বকীয় ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক ভিত্তি এ রাষ্ট্রের উদয়লগ্নেই যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শীয় ফলাফল সূচিত করে তা অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে আমেরিকান গণতন্ত্রের বর্তমান পর্যায়ে। জেফারসনের রাজনৈতিক দর্শনের একটা মূল প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতার গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তির অধিকারের সমস্যা। তাঁর মতে'রাষ্ট্র ক্ষমতার কাজ হলো মানুষের সেই সব স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা। যা সে নিজে রক্ষা করতে পারে না। নাগরিক অধিকারের মধ্যে তিনি অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন রাজনৈতিক অধিকারকে। যা তার মতে মুক্তশাসনের বুনিয়াদ। তিনি মনে করতেন, জনগণের কর্ম হলো রাজনৈতিক ন্যায় ও রাষ্ট্রক্ষমতার স্বেচ্ছাচার থেকে আত্মরক্ষার মূর্তায়ন'। তিনি

আরো বলেন 'আমাদের শাসনের ভিত্তি হলো জনগণের অভিমত। জনগণের ভুলভ্রান্তির প্রতি বেশি কঠোর হবেন না। শিক্ষাদান মারফত তাদেরকে সুসভ্য করে তুলুন'। আমাদের অনেকের ধারণা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে শুধু অধিকাংশের ইচ্ছাকে গ্রহণ করা। জেফারসন এই মতের বিরোধীতা করেছেন। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন 'অধিকাংশের ইচ্ছাকে গ্রহণ করলেও দৃষ্টি রাখতে হবে তা যেনো ন্যায়সংগত হয়। সে জন্যে রায় গ্রহণকারী হতে হবে বিচক্ষণ। সচেতন থাকতে হবে যাতে সংখ্যালঘুর সমান অধিকার নষ্ট না হয়। যদি হয় তবে তা হবে উৎপীড়ন? প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো বলেন, যারা জনগণকে ভয় পায় আমি তাদের দলে নেই'। টমাস জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রণেতা ছিলেন। তিনি ১৮০১খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জাতিকে গণতন্ত্রের নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন 'আমরা সবাই প্রজাতন্ত্রী, সবাই ফেডারেলিস্ট্র। নানাভাবে নানা নামে আমরা অভিহিত করি একই নীতিকে'। গণতন্ত্রের সজ্ঞায় বেশির ভাগের মতামত গ্রহণযোগ্য হলেও দার্শনিক জেফারসন এতে শর্ত যুক্ত করে বলেছেন, 'কোন প্রতিষ্ঠান অসৎ লোকের হাতে পড়লে অনাচারের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।' গণতন্ত্র তাত্তিকদের এভাবে প্রচুর ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পাই। ওদের সবার তাত্ত্বিক আলোচনায় কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মৌলিক বিষয়ে সবার মত অভিন্ন। অনেকের বক্তব্যে স্ববিরোধী অনেক কথাও রয়েছে। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র সম্পর্কে যত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে চুম্বক এবং গুরুত্বপূর্ণ আব্রাহাম লিঙ্কনের ব্যাখ্যা। আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-৬৫খ্রিস্টাব্দ) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এক ঘোষণায় বলেছিলেন ***It is a government of the people by the people and for the people*** অর্থাৎ 'জনগণের শাসন, জনগণের কর্তৃক, জনগণের জন্যে'। আধুনিক গণতান্ত্রিকদের মতে এই ঘোষণাই গণতন্ত্রের মূল দর্শন। যদিও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গণতন্ত্রের জন্ম গ্রীসে, তবু অনেকে শুধু এই ঘোষণার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে 'ফাদার অফ ডেমক্রসি' বা 'গণতন্ত্রের পিতা' মনে করেন। সে যাই হোক। এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক সংজ্ঞা বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দার্শনিকগণ দিয়েছেন এতক্ষন আমরা তা আলোচনা করলাম। এখন আমরা চেষ্টা করবো গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী দর্শনের সংঘাত কোথায় এবং কেন? সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষনের। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সংঘাত সমূহ সার্বভৌমত্বের সংঘাত গণতন্ত্রের সাথে

ইসলামের প্রধান মৌলিক সংঘাত সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে৷ সকল সার্বভৌমত্বের মালিক পূর্বে উল্লেখিত গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকদের সকল ব্যাখ্যা এক করলে সারমর্ম দাঁড়ায় আমেরিকার এক সময়ের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের উক্তি ‘মানুষের শাসন মানুষের জন্যে মানুষ কর্তৃক ’ তৈরী করার নাম গণতন্ত্র। এই কথাগুলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়েছে ‘গণতান্ত্রিক শাসনের সার্বভৌমত্ব মানুষের করায়ত্তে এবং তা ব্যবহৃত হয় মানুষের হাতে’। এখানে ‘সার্বভৌমত্ব মানুষের করায়েত্তে’ বলা হয়েছে। অন্যদিকে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বলা হয়েছে, ‘তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুর শ্রেষ্ঠ৷ অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি-ই সার্বভৌমের কার্য নির্বাহী। (সুরা আনআম-১০২) ‘চূড়ান্ত হুকুম দেয়ার-সার্বভৌমত্বের-অধিকার কারোরই নেই, আছে কেবল একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি পরম সত্য কথা বলেন, আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সুরা আনআম-৫৭) ‘বলুন; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বের কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম বর্ণনা করতে থাকুন। (সুরা বানী ইসরাঈল-১১১) ‘‘তিনি-ই আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, তিনি-ই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্মশীল, তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা’আলা তা থেকে পবিত্র।” (সুরা হাশার-২৩) ‘‘তিনি-ই আল্লাহ্ তা’আলা স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁর, নভোমন্ডলে ও ভু-মন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। (সুরা হাশর-২৪)

এ ছাড়াও পবিত্র কোরআনে করিমে অসংখ্য আয়াত রয়েছে মহান আল্লাহ তা’আলার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। এর পরও যদি কেউ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে অন্য কাউকে মালিক করে বসায় তবে ইসলামী পরিভাষায় তাকে মুশরিক বলা হয়ে থাকে। আরবি ‘শিরক’ শব্দ থেকে তা এসেছে। আল্লাহর গুণাবলী বা কর্তৃত্ব আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে অন্যের প্রতি আরোপ কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা-উপাসনা করাকেই ইসলামী

পরিভাষায় শিরক বলা হয়। এই হিসাবে গণতন্ত্র কর্তৃক মানুষের সার্বভৌম্ব ঘোষণাকে সম্পূর্ণ একটি শিরক বলা যায়।

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

আমাদের জানা প্রয়োজন সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায়? আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দেখতে পাই ‘ক্ষমাতর এক কেন্দ্রিকতা, সার্বিক ও সর্বাত্মক ক্ষমতা, প্রধান্য ও প্রতিপত্তিমূলক কর্তৃত্বসহ সর্বপ্রকার ফল ও কাজের স্বাধীনতা, মহত্ত ও মহিমা সর্বোচ্চ, চিরন্তন ও চিরঞ্জবি হওয়া।’ মহাগ্রন্থ কোরআনে করিম সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যায় ঘোষণা করেছে সার্বভৌম নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগে পূর্ণ স্বাধীন ও নিরংকুশ যা ইচ্ছা তাই করার অধিকারী? সার্বভৌম যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে না, তিনি কারো নিকট জওয়াবদিহি করতে বাধ্য নয়। বরং সকলেই একমাত্র তাঁর সমীপেই জওয়াবদিহি করতে বাধ্য। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্রেঞলী তাঁর দর্শন গ্রন্থে স্বীকার করেছেন সার্বভৌমত্বূর স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের মধ্যে নিহিত। আল্লামা রাগেব ইসফাহানী সার্বভৌমত্বের ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রবল পরাক্রম সহকারে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। (মুফারাদাত-পৃঃ ২৩৮)। আল্লামা আলুসীর মতে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সত্তাই সার্বভৌম। (ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা ও মাওলানা আব্দুর রহীম) তাই ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনে ঘোষণা করা হচ্ছে প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার মৌলিক এবং চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র আল্লাহর। (সুরা আনআম-৫৭) আল্লাহর এই প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকার নিরংকুশ, অন্য কেউ তার অংশীদার হতে পারে না। কাউকেও তিনি এ কাজে শরীক করেন না। নিরংকুশ ক্ষমতাশালী মহাসত্য, সর্বোচ্চ ও সর্বোপরি আল্লাহ। (সুরা মুমিনুন-১২) আল্লামা রাগেব ইসফাহানী বলেন, সার্বভৌমত্ব এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হতে বা কারো পক্ষে এই গুণে গুনান্বিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহঃ) বলেন মানব জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু’একজন লোক ছাড়া মানব সমাজ সামগ্রিকভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব কিংবা বিশ্বজগতের উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করেনি। বরং তারা সময়ান্তরে আল্লাহ তা’য়ালার গুণাবলী সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেছে। অথবা তার সাহায্যকারী হিসেবে আরো অনেক

খোদার কল্পনা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস এবং পূজা-উপসনার ক্ষেত্রে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যকারী বা অংশীদার নিরূপণ করেছে। এ উভয়বিধ পন্থাই শিরক।

ইমাম আল-গাজালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাকীম আবু নছর প্রমুখ ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই কারণে কেবল আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারীরূপে ঘোষণা করেছেন নিজ নিজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রন্থে। আধুনিক মতাবদ সার্বভৌমের এই সব বিশেষ গুণকে অপরিহার্য মেনে নিয়েছে বটে: কিন্তু আধুনিক মতবাদ প্রকৃত সার্বভৌম সত্তার সন্ধানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উহা আল্লাহকে সার্বভৌমরূপে মেনে নেয়নি। ফলে সার্বভৌমত্বের অধিকারী নির্ধারণে যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। একটি মত এই যে, রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও নিরংকুশ ক্ষমতাই সার্বভৌম। ইহা বদিন-এর মতবাদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন সামগ্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সার্বভৌমত্বের অধিকারী নহে, কেননা উহা বাহ্যিকভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের নানা প্রকারের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে বাধ্য হয়ে থাকে। এই কারণে শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কর্তৃক এই মতবাদ বাতিল করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মত এই যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক সার্বভৌমত্বের অধিকারী। লুই চতুর্দশ (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) নিজেকে সার্বভৌম বলে মনে করতেন, হানুয়ার-এর ১৮১৪ সনের ঘোষণায় বলা হয়েছে: গ্রেট বৃটেনের সম্রাট রাজকীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী। (বেলঞ্জলী) ইংল্যান্ডের আইনে মুকুট (সম্রাটের ব্যক্তি-সত্তা) সার্বভৌম বলে স্বীকৃত। যদিও তাহার সার্বভৌমত্বকে ধর্মের নিকট থেকে হাসিল করতে হয়। বস্তুতঃ ইংল্যান্ডের রাজকীয় সার্বভৌমত্ব এক দুর্বোধ্য ব্যাপার? (ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা- পৃঃ ৩৮-৩০)

সমগ্র জিনিসের সার্বভৌমত্ব কার হাতে নিহিত?

এই প্রশ্নের জবাবে তিনিই আবার বলে দিচ্ছেন মহান পবিত্র সেই সত্তা, তাঁহার হাতে সব কিছুরই সার্বভৌমত্ব নিহিত। যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের সার্বভৌমত্ব মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক বলেন, ভিন্ন ভিন্ন সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করা ভালো, না মহাপরাক্রমশালী

এক আল্লাহকে সকল প্রকার সার্বভৌমত্বের মালিক স্বীকার করা উত্তম? (সুরা ইউসুফ- ৩৯) আমরা এতক্ষণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী সম্পর্কিত মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের ভাষ্য শুনলাম এবং অবগত হলাম গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে সার্বভৌমত্বের মালিক নিয়ে বিরাট সংঘর্ষের কথা। এখন সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন আমরা কোন পথে যাবো এবং সার্বভৌমত্বের মালিক হিসেবে কাকে গ্রহণ করবো। যারা আল্লাহকে সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করে না অথবা তাঁর সার্বভৌমত্বের সাথে অন্য কাউকে শরিক করে তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি? এ বিষয়টিও বুঝা প্রয়োজন। একজন মানুষ যদি প্রকাশ্য ইসলামকে অস্বীকার করে তাকে নিয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। তবে কেউ যদি নিজকে মুসলমান কিংবা ইসলামী আন্দোলনে নেতা কর্মী বলে দাবী করে আর আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়, তবে তার সম্পর্কে আমাদের ঐ প্রশ্ন থেকে যাবে। মুসলমান দাবী করতে হলে অবশ্যই কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ মনে করতে হবে। সব কিছু দেখতে হবে কোরআনিক দর্শনে, অন্য কোন কিছু দিয়ে নয়। প্রচলিত স্রোত কিংবা কোন অমুসলিমের দর্শন দিয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা করতে গেলে ঈমানে বিভ্রান্তির গ্রাস অনিবার্য। আমাদের অনেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজেন। তা যদি জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে হয় তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তিনি মনে করেন এই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি ইসলামের সত্যতা, প্রয়োজনীয়তা,বিজ্ঞান মনস্কতা, যুগোপযুগিতা ইত্যাদি প্রমান করবেন তা হলে প্রশ্ন জাগে যে আল্লাহ এবং রাসুল (স.) যা বলেছেন তা কি চূড়ান্ত নয়? বিজ্ঞানের কথা কি কোরআন হাদিস থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি কেউ বিজ্ঞানীদের কথাকে আল্লাহ এবং রাসুল (স.) এর বক্তব্য থেকে বেশি গুরুত্ব দেয় তা হলে ঈমান কোথায় থাকলো? আমরা বুঝি এমনটি যারা করছেন তাদের বেশির ভাগে না বুঝে করছেন। তারা এমনটি করছেন মূলত প্রতিপক্ষকে একথা বুঝাতে যে ইসলাম একটি বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম। এমন চিন্তাটাও এক প্রকারের বিভ্রান্তি। ইসলামকে বিজ্ঞান সম্মত করার প্রচেষ্ঠায় না গিয়ে যদি আমরা বিজ্ঞানকে ইসলাম সম্মত করতে চেষ্ঠা করতাম তাতে বিজ্ঞান এবং মানবসমাজ উভয়ই উপকৃত হতো। স্মরণ রাখতে হবে বিজ্ঞান নিজেই তার আজকের ব্যাখ্যাকে আগামী কালের জন্য চূড়ান্ত মনে করেনা। কোরআন তার চূড়ান্ত দার্শনিক কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। এখানে আর নতুন করে ব্যাখ্যা দেয়ার কিছু নেই, বরং নিত্যনতুন ব্যাখ্যা সমূহকে ইসলামের সাথে মিলিয়ে গ্রহণ এবং বর্জন করতে হবে। জলের স্রোতের সাথে সর্বদা শেকড়হীন

বস্তুই ভেসে যায়। ইসলাম এবং মুসলমান সময়ের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না, যেহেতু কোরআন-হাদিসে তার শিকড় রয়েছে। আমরা সেই শিকড়ের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিবেচনা করতে চাই যে, একজন মুসলমান গণতন্ত্রকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে? গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে ইসলামের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলেই প্রকৃতপক্ষে মোমের আলো দিয়ে সূর্য্যরে আলো খুঁজার সমতুল্য হয়ে যাবে। তাই আমরা এই আলোচনায় ইসলামের আলোকে গণতন্ত্রের অবস্থান দেখতে চেষ্টা করছি। যেমন মনে করুন 'মানুষ কর্তৃক মানুষ পরিচালনার আইন প্রণয়ন' গণতন্ত্রের একটি দর্শন। আমরা এখন এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করবো।

প্রসংঙ্গঃ আইন প্রণয়ন এবং প্রণেতা

গণতন্ত্র তাত্তিকদের প্রায় সকলের মতে 'আইন প্রণেতা একমাত্র জনগণ। জনগণের বেশি অংশ যে মতামত প্রকাশ করবে তাই আইন বলে গণ্য হবে। ইচ্ছে করলে জনগণ যে-কোন আইন পরিবর্তন বা সংস্কার করতে পারে'। গণতন্ত্রের এই দর্শন থেকে বলতে পারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট আইন গ্রহণযোগ্য নয়। বেশির ভাগ জনগণ যখন যে রায় দেবে তখনই তা জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আদালতে বিচারপতি নির্দিষ্ট আইনের ধারায় রায় ঘোষণা করা গণতান্ত্রিক দর্শনের পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক নিয়মে রায় হবে বেশির ভাগের মতামতে। সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে আইন কি হবে? দেশ কিভাবে চলবে? তা কোন গণতান্ত্রিক-ই বলতে পারবেন না। অর্থাৎ গণতন্ত্র মানেই অনিশ্চিত ভবিষ্যত। গণতন্ত্রের মূল যে দর্শন তা যদি সত্য-ই কোনদিন কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় তবে মানবতার দৃষ্টিতে তা হবে জংলী শাসন। কোনো সভ্য সমাজ এমন জংলী শাসন গ্রহণ করেছে বলে বিগত দিনের কোনো ইতিহাসে নেই। তাই বলা যেতে পারে মানব ইতিহাসে কখনো প্রকৃত গণতন্ত্র ছিলো না, আসবে বলেও মনে হয় না। আমরা যে সব দেশে গণতন্ত্রের কথা শোনছি বা দেখছি তা হচ্ছে মূলত শাসকশ্রেণীর তৈরি গণতন্ত্রের নামে ফাঁকি-মেকি। আধুনিক গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে সকল দার্শনিকদের নাম পাওয়া যায় ওদের বেশির ভাগই ক্ষমতা ঘেষা। তাই তাদের দর্শনগুলোও ক্ষমতাকেন্দ্রিক। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যেহেতু জনগণের

সকল অংশ আইন প্রণয়নের অংশীদার হওয়া সম্ভব নয়, তাই জনগণের তৈরি প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করবেন, তাদের কর্তৃক প্রণীত আইন-ই জনগণের আইন হিসেবে গণ্য হবে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই প্রকার প্রতিনিধিদেরকে বলা হয় শাসক, আর তাদের তৈরি আইনকে বলা হয় শাসন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা দু রকমের হয়ে থাকে-এক; পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় পদ্ধতি৷ দুই; প্রেসিডেন্সিয়াল বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি। উভয় পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হয় জনভোটে। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে প্রধান জনপ্রতিনিধি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। যিনি নির্বাচিত হোন সরাসরি জনগণের ভোটে। তিনি দায়বদ্ধ থাকেন জনগণের কাছে। আর পার্লমেন্টারী পদ্ধতিতে জনগণের ভোটে প্রথমে সদস্যগণ নির্বাচিত হোন। এরপর যে দলের বিজয়ী সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন তারা সরকার গঠন করবেন। এই দলের নেতা বা নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার প্রধান হয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী দায়বদ্ধ থাকেন মন্ত্রীসভার কাছে। মন্ত্রীসভা সংসদের কাছে। সংসদ সদস্যগণ জনগণের কাছে। গ্রাম্য প্রবাদে এর নামই 'সাত লাঠিতে বেগুন পাড়া' । এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতেই পাই শাসক দার্শনিকেরা জনগণকে সার্বভৌমত্তের বাকলহীন কলা দেখিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। এক্ষেত্রে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল গাদ্দাফীর একটি আলোচনা কিছুটা হলেও বিবেচনার দাবি রাখে। তাঁর মতেসমকালীন যুগে প্রচলিত প্রথাগত গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড পার্লামেন্টসমূহ । কিন্তু প্রকৃত অর্থে, জনগণের ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্বেরই প্রতীক একটি পার্লামেন্ট। আর পার্লামেন্টারি সরকার হলো গণতন্ত্রের সমস্যার একটি বিভ্রান্তিকর সমাধান-মাধ্যম। জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যেই আদতে পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কাঠামোগতভাবেই এটি অগণতান্ত্রিক। কারণ, গণতন্ত্রের অর্থ হলো জনগণের কর্তৃত্ব-জনগণের পক্ষে কার্যরত কোনো কর্তৃত্ব নয় । একটি পার্লামেন্টের আত্মসর্বস্ব অস্তিত্বের অর্থ, গণতন্ত্রে জনগণের অনুপস্থিতি । অথচ কেবলমাত্র জনগণের শরিকানা তথা তাদের পরিপূর্ণ অংশীদারিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান প্রকৃত গণতন্ত্র। জনগণের বদলে জনগণের প্রতিনিধিদের কার্যক্রমে গণতন্ত্রের সঠিক প্রতিফলন কিছুতেই ঘটতে পারে না। জনগণ এবং কর্তৃত্বের এখতিয়ার প্রয়োগের মাঝখানে একটি আইনসম্মত প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান পার্লামেন্টসমূহ । আইনের এই প্রাচীরগুলো জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখছে ক্ষমতা থেকে। আর তাদের বদলে জবরদস্তিমূলকভাবে ভোগ করছে সার্বভৌমত্বের অধিকার। আর শুধুমাত্র গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক খোলসের দ্বারা

জনগণকে পরিতৃপ্ত রাখা হচ্ছে। এ গণতন্ত্রের নগ্ন স্বরূপ ধরা পড়ে ব্যালট-বাক্সে ভোটদানের জন্যে সমাগত মানুষের সুদীর্ঘ সারিতে। পার্লামেন্টের এই অন্তঃসারশূন্য চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হলে এর মূল কাঠামোর গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে আমাদের। নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে কিংবা কোনো পার্টি বা পার্টি সমূহের কোয়ালিশনের মাধ্যমে একটি পার্লামেন্টের নির্বাচন হতে পারে। অথবা মনোনয়ন পদ্ধতিতেও গঠিত হতে পারে পার্লামেন্ট। কিন্তু এই সব ক'টি পদ্ধতিই পুরাদস্তর অগতান্ত্রিত। কারণ, নির্বাচনী কেন্দ্রসমূহে জনসংখ্যাকে বিভক্ত করার অর্থ হলো : একজন পার্লামেন্ট সদস্য কয়েক হাজার, কয়েক লাখ, এমনকি কয়েক মিলিয়ন লোকেরও প্রতিনিধিত্ব করার এখতিয়ার লাভ করতে পারেন। বিষয়টি নির্ভর করছে একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে কত জনসংখ্যা রয়েছে, তার ওপর। এ ধরণের ব্যবস্থায় নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে কোনোরকম গণভিত্তিক সাংগঠনিক সংযোগ রাখতে পারেন না। কেননা, অন্যসব সদস্যের মতো তাঁকেও সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রচলিত রেওয়াজের প্রথাগত গণতন্ত্রের জন্যে এটা অপরিহার্য। এর কল্যাণে জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধির কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং একইভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিও আগাগোড়া তাদের কাছ থেকে থাকেন বিচ্ছিন্ন। কারণ, জনগণের ভোটলাভের অব্যবহতি পরেই তিনি তাদের সার্বভৌমত্ব কুক্ষিগত করেন এবং তাদের বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। প্রচলিত এই প্রথাগত গণতন্ত্র একজন পার্লামেন্ট সদস্যকে এতটা পবিত্রতা এবং সর্বক্ষেত্রে এমন এক অলংঘনীয় অব্যাহতির এখতিয়ার দিয়ে থাকে যার দুয়ার সমাজের অন্য সবার জন্যে বন্ধ। এর অর্থ, পার্লামেন্টসমূহ জনগণের কর্তৃত্ব লুণ্ঠন ও জবরদখল করার একটি যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং, যেসব যন্ত্র গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বকে জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুক্ষিগত করে, সেই যন্ত্রগুলোকে গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার রয়েছে জনগণের। জনগণের পরিবর্তে কোনো প্রতিনিধিত্ব চলবে না- একইভাবে এ ধরনের নতুন নীতি ঘোষণাও পূর্ণ অধিকার আছে জনগণের। পক্ষান্তরে, নির্বাচন-বিজয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে কোনো একটি দল কর্তৃক পার্লামেন্ট গঠিত হলে সেই পার্লামেন্ট হবে দলীয় পার্লামেন্ট-জনগণের নয়। এ ধরনের পার্লামন্টে বিজয়ী দলটিরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণ থাকে তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আর পার্লামেন্ট কর্তৃক নিরূপিত সমস্ত প্রশাসনকি

ক্ষমতাও ভোগ করে থাকে উক্ত বিজয়ী দল। এতে জগণের কোনো কিছু বলার বা করার থাকে না। যে পার্লামেন্টে প্রতিটি দলের কব্জায় থাকে কিছু সংখ্যক আসন, সেক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। কারণ, পার্লামেন্ট সদস্যরা তাঁদের নিজ নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। এক্ষেত্রে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোনো বালাই তাঁদের থাকে না। এ ধরনের কোয়ালিশনের মাধ্যমে অধিষ্ঠিত ক্ষমতার অধিকারী কেবলমাত্র কোয়ালিশনের অন্তর্গত দলসমূহ-জনগণ নয়। অনুরূপ বিধি-ব্যবস্থার অধীনে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অসহায় শিকারে পরিণত হয়, তাদের দ্বারা প্রতারিত এবং শোষিত হয়। আস্তাকুঁড়ে যেভাবে বাজে কাগজ ছুঁড়ে ফেলা হয়, ঠিক সেভাবেই ব্যালট বাক্সে ভোটের কাগজ নিক্ষেপ করেন লম্বা সারিতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারগণ। গোটা বিশ্ব জুড়ে এই প্রথাগত গণতন্ত্রই আজ প্রচলিত। এক-দলীয়, দ্বি-দলীয়, বহু-দলীয় কিংবা দলবিহীন যে-কোনো পদ্ধতিতেই তাকে চিহ্নিত করা হোক না কেনো তার প্রকৃত স্বরূপ হলো এই। প্রতিনিধিত্ব কথাটাই যে সম্পূর্ণ ধোকাবাজি, এর থেকে তা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনোনয়ন কিংবা বংশানুক্রমিক আওতায় পড়ে না। অপরপক্ষে, নির্বাচনভিত্তিক পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ভোট বগলদাবা করার জন্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় প্রচারণার ওপর। সুতরাং প্রকৃত অর্থে একে একটি বক্তৃতা-নির্ভর বা বাচনসর্বস্ব পদ্ধতি বলা যায়। এই পদ্ধতির নির্বাচনে ভোট অবাধে কেনা যায় এবং ভোট নিয়ে ধোকাবাজি কিংবা জালিয়াতিও চলে। এ ধরনের নির্বাচনী অভিযানে দরিদ্র লোকেরা প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম এবং সর্বদা ধনীরা, শুধুমাত্র ধনীরাই এতে বিজয়ী হয়ে থাকেন। ব্যক্তি গাদ্দাফীর চরিত্র কিংবা প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর শাসন পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন এবং বিতর্ক আছে কিন্তু পার্লামেন্ট সম্পর্কিত তাঁর এই বক্তব্য কিছুটা হলেও চিন্তায় নাড়া দিয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক আব্দুর রহীম এর গণতন্ত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন ‘বলা হয়, গণতান্ত্রিক শাসনেই জনমতের প্রতিফলন ঘটে। জনগণের মতই তাদের নির্বাচিত ব্যক্তিদের পার্লামেন্ট সদস্য বা প্রেসিডেন্টের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে। এ কথাটি যে কতখানি অসত্য ও ভিত্তিহীন, তা যে-কোন তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়। ...বলা হয়, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। হ্যাঁ, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে এক ব্যক্তির নিরংকুশ শাসন এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে মুষ্টিমেয় নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশি সদস্যদের, তাদের দলীয় নেতার

‘প্রধানমন্ত্রী’র নিরংকুশ শাসন। কেননা দলীয় প্রধানই প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা। জাতির অল্প সংখ্যক লোক দ্বারাই শাসিত হয় দেশের কোটি কোটি মানুষ। তাদের রচিত আইন-ই হয় দেশের আইন, তা মানতে বাধ্য হয় গোটা জনগণ। ফলে মানুষ হয় মানব রচিত আইন দ্বারা শাসিত। (ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা) ‘জনগণ বা জন প্রতিনিধিগণ-ই হবেন আইন প্রণেতা’ গণতন্ত্রের এই দর্শন সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বলা হয়েছে: ‘প্রভূত্ব-সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার মৌলিক এবং চূড়ান্ত অধিকার একমাত্র আল্লাহর।’ (সুরা আনআম- ৫৭) ‘আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে’। (সুরা কাসাস- ৮৮) ‘তারা কি জাহেলিয়াতের আইনকানুন তালাশ করে? আল্লাহ্ পাক অপেক্ষায় ঈমানদারদের জন্য উত্তম আইন প্রণয়নকারী কে আছে? (সুরা মায়েদা- ৫০)। ‘আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা কাফের।’ (সুরা মায়েদা- ৪৪) যেহেতু গণতন্ত্রের দর্শন হচ্ছে ‘জনগণ বা জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়ন’ তাই কোরআনের পরিভাষায় গণতন্ত্রকে একটি কুফরী মতবাদ বলা যায়। গণতন্ত্র মূলত পুঁজিবাদীদের তৈরী শোসনের একটি হাতিয়ার। শোষকেরা চাতুর্যের মাধ্যমে মানুষকে নীতিহীন করে দিতে এখানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষ আর আল্লাহকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে চাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে আইনতো আর জনগণ তৈরী করেনা, করে শাসক শ্রেণী শাসক শ্রেণী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থটাই দেখে থাকে।

আইনের স্থায়িত্ব

আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্র বলছে আইনের কোন নির্দিষ্টতা নেই। জনগণ যখন চাইবে তখন আইনসভা আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য থাকবে। যার কারণে গণতান্ত্রিক আইনসভায় যদি কোরআন-হাদিসের অর্থাৎ কোন শরয়ী আইন পেশ করা হয় আর যদি সেটা তাদের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার খেলাফ হয় বা মনঃপূত না হয়, তবে সে সব শরয়ী আইন সেখানে উপেক্ষিত হয় বা

আদৌ গৃহীত হয় না। অনেক গণতান্ত্রিকগণ এই শরয়ী আইনকে অগ্রহণযোগ্য বলতেও ভয় করেন না। তাদের মতে জনগণের চাহিদা মতো আইন প্রণয়ন-ই আমাদের দায়িত্ব। কারণ আমরা জনপ্রতিনিধি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে গণতন্ত্রের এ বিষয়ে রয়েছে বিরাট মতবিরোধ। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য হচ্ছে 'এবং শাসন কার্য পরিচালনা কর লোকদের মধ্যে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী এবং লোকদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করো না। (সুরা মায়েদা- ৪৯) 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল যখন কোন বিষয়ে আদেশ করেন- চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ-স্ত্রীর জন্য তাদের ব্যাপার সংক্রান্ত এই হুকুম বা ফয়সালা মেনে নেয়া না নেয়ার কোন ইখতিয়ার-ই থাকতে পারে না। যদি কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অমান্য করে তাহলে সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়ে গেল। (সুরা আহযাব- ৩৬) 'আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা বিচার-ফয়সালা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা কাফের। (সুরা মায়েদা- ৪৪) 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধানকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর (হে মুহাম্মদ) যা তোমার প্রতি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি, আর যার হেদায়ত আমরা ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম এ তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এ দ্বীনকে এবং এতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেও না।' (সুরা আশ্ শূরা- ১৩) 'আমার কর্মনীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।' (সুরা বনি ইসরাইল- ৭৭) পবিত্র কোরআনের এই আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্ট যে, কারো কামনা-বাসনা অনুসারে আইন পরিবর্তন সম্পূর্ণ হারাম। আর যারা তা করবে তারা গুমরাহ এবং কাফের। গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থায় আইন পরিবর্তনের দর্শন এই দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ কুফরী। গণতন্ত্রে পুরুষ ও মহিলার ভোটের মান সমান বলে সাব্যস্ত করেছে। ভোটকে আমরা একটা স্বাক্ষ্য বলে মনে করতে পারি যুক্তিসংগত কারণে। ভোট দেয়া অর্থ এই স্বাক্ষী দেয়া যে, এই লোক এই কাজসমূহ পরিচালনা করার যোগ্য। অথচ স্বাক্ষীর ব্যাপারে পবিত্র ইসলামের বিধান হচ্ছে: 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন স্বাক্ষী দাঁড় করাও, যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ, দু'জন মহিলার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করো। (সুরা বাকারা- ২৮২) ইসলাম বলছে দু'জন মহিলা স্বাক্ষী একজন পুরুষের সমান, অথচ গণতন্ত্র বলছে একজন মহিলার স্বাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এখানে পবিত্র কোরআনের একটি বিধানকে অস্বীকার করা হচ্ছে। নারীরা নারীত্বের পূর্ণাঙ্গ এবং ন্যায্য অধিকার লাভ করুক তা আমাদের হৃদয়ের কথা। কিন্তু যে বিষয় কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক তা মনে না মানলে ও

পরিহার করতে হবে মুসলমান দাবীদার হলে যারা পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তনের মানসিকতা রাখে কোরআনের পরিভাষায় ওরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট। গণতন্ত্রের আরেকটি দর্শন হচ্ছে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা। এখানে বহুদলীয় মত-পথের অস্তিত্বকে স্বীকার করা আবশ্যকীয় শর্ত করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের মতামতের গুরুত্ব দিয়েছে মানবিক দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টিটাও হতে হবে ইসলামিক বিধান মতো। মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ঘোষণা করছে: 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সুরা ইমরান- ১০৩) হে নবী! আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর এবং তাদের খেয়াল-খুশির প্রতি কোন গুরুত্ব দিও না। তাদের সম্পর্কে সর্তক থাক, অন্যথায় তারা তোমাকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবে। (সুরা মায়েদা- ৪৯)

নির্বাচন প্রসঙ্গ

প্রচলিত গণতন্ত্র বলতেই বুঝানো হয় নির্বাচন কিংবা গণভোট । এটাই মূলতঃ গণতন্ত্রের বুনিয়াদ বা ভীত। জনপ্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। আর গণতন্ত্রের প্রত্যেক কাজে 'মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড' অর্থাৎ সব কিছুই নির্ধারিত হয় সংখ্যাধিক্যে। ভোটের বেশির ভাগ অংশ যার পক্ষে থাকে সেই হবে জনপ্রতিনিধি। এখানে ভোট পাওয়াটাই জনপ্রতিনিধি বা নেতা হওয়ার যোগ্যতা। নির্বাচন নিয়ে গণতন্ত্রিক দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত আমরা পূর্বের আলোচনায় প্রচুর পেয়েছি, যেমনঃ দার্শনিক শার্ললুই মতেঁস্ক্য বলেছেন; লটারী মারফত (জনপ্রতিনিধি) নিয়োগ গণতন্ত্রের প্রকৃতি' । তিনি আরো বলেন 'ভোট দানের পদ্ধতি নির্ণয়ের আইন ও গণতন্ত্রের বুনিয়াদী আইনের অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে ভোট দান প্রকাশ্য না গোপনে হবে এ প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভোট যেহেতু জনগণ দেয় তখন নিঃসন্দেহে তা হওয়া উচিৎ প্রকাশ্য' । দার্শনিক জেফারসনের মতে 'অধিকাংশের ইচ্ছাকে গ্রহণ করলেও দৃষ্টি রাখতে হবে তা যেনো ন্যায়সংগত হয়। সে জন্য রায় গ্রহণকারী হতে হবে বিচক্ষণ এবং সচেতন থাকতে হবে যাতে সংখ্যাল্পের সমান অধিকার নষ্ট না হয়। যদি হয় তবে তা হবে উৎপীড়ন।' তিনি আরো বলেন, 'যারা জনগণকে ভয় পায় আমি তাদের

দলে নেই'। দার্শনিক টমাস হবস-এর মতে 'গণতন্ত্রের সব কিছুই নির্ধারিত হয় সংখ্যাধিক্যে। আর সংখ্যাধিকেরা ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে থাকে স্বল্পজ্ঞানী। তাই অধিকাংশের ক্ষেত্রে তাদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত হয় বেঠিক'। দার্শনিক জনলকের মতে 'নির্বাচনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' গণতান্ত্রিক দার্শনিকদের মধ্যে নির্বাচন এবং নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত থাকলেও বেশির ভাগই নির্বাচন-গণভোটের পক্ষে। কারণ গণতান্ত্রিক দর্শনের মূল ভীত নির্বাচন। রাষ্ট্র এবং সমাজের নেতা-জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট, এম.পি ভোটে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির এই নির্বাচনকে মানতে পারছিনা। কারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শতকরা ৫১ ভাগ ভোট একজন প্রার্থীকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে। এখন প্রশ্ন হলো বাকী ৪৯ ভাগের মতামতের কি কোনো মূল্য নেই? তাহলে কি বলা যাবেনা যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছদ্মাবরণে নির্বাচন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে স্বৈরতন্ত্রী একটি শাসন সংস্থাকে। কেননা, ভোটারদের বাদবাকি শতকরা ৪৯ ভাগ শাসিত হয় এমন এক শাসনতন্ত্র দ্বারা যার পক্ষে তারা ভোট দেয়নি। অথচ তাদের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া, রাজনৈতিক সংঘাত অনেক সময় এমন একটি দল বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারে যারা কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করেন। কারণ, তারা যে ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তা মূলত রাজনৈতিক বিভক্তি কিংবা সংঘাতগত কারণে হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দি যে-সব প্রার্থী কম ভোট পেয়ে থাকেন, তাঁদের সমস্ত ভোট একত্র করলে দেখা যাবে তাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে, প্রচলিত নিয়মে কম ভোট পেয়েও বিজয়ী হন একজন প্রার্থী। আর তাঁর সাফল্যকে আইনসঙ্গত বলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আড়ালে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় স্বৈরতন্ত্রকে। আদর্শহীন দুনিয়ায় প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলীর এহলো এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এর প্রতিটিই স্বৈরতান্ত্রিক এবং এসব ব্যবস্থার স্বরূপ স্পষ্টতঃ গণতন্ত্রকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। অন্যদিকে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র দর্শনে দেখতে পাই ইমাম, খলিফাহ্ বা নেতা নিয়োগে জনমতের গুরুত্ব রয়েছে। কেউ নিজেকে তা দাবী করে বসলেই হতে পারে না। কেউ থাকে মানেও না। মানতে বাধ্যও নয়। জনমতের ভিত্তিতে কর্মরত যোগ্য কোন ইমাম, খলিফাহ্, নেতা দায়িত্বশীলকে অস্ত্র দেখিয়ে, শহীদ করে, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হঠিয়ে কেউ যদি ক্ষমতা দখল করে বসে ইসলামী দর্শনমতো তা অবৈধ বা হারাম বলে ঘোষিত হবে। কারণ মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বলা হয়েছে; 'মুসলিম জনগণের সামষ্টিক

ব্যাপারাদি পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে ।' (সুরা শুরা-৩৮) গায়ে মানে না আপনি মুড়লের দায়িত্ব-ই শুধু হারাম নয়, তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাও হারাম। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) ঘোষণা করেন; 'মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়'আত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় । (মসনদে আহমদ)

শুধু তাই নয়, এমন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কথা বলার নির্দেশ ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহাকারে দিয়েছে; রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের সামনে যদি কেউ অন্যায় কাজ সংগঠিত হতে দেখো তবে তা যথাসম্ভব হাত দিয়ে দমন করো, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করো, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করো। এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর' । (মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী) ইসলামী দর্শনে নেতা নিয়োগে জনমতের গুরুত্ব আর গণতন্ত্রের নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি এক নয় । এখানে মৌলিক অনেক ব্যবধান রয়েছে । যেমনঃ গণতান্ত্রিক নেতা নির্বাচনে দায়িত্ব নেয়ার আগ্রহ দেখাতে হয়, প্রার্থী হতে হয়, নিজের পক্ষে ক্যানভাস চালাতে হয়, বিজয়ী হওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়, অগ্রিম বিভিন্ন ওয়াদা করতে হয় ইত্যাদি । ইসলাম এই প্রার্থীত্বকে বৈধ বলে মনে করে না। নেতৃত্ব লাভের আশা, চেষ্টা ইত্যাদিকেও ইসলাম অগ্রহণযোগ্য মনে করে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেনঃ 'আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি নিজে কোন পদ লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করবে কিংবা কোন পদের প্রতি লোভ প্রদর্শন করবে, তাকে আমি কখনই কোন পদে নিযুক্ত করব না' । (বোখারী-মুসলিম) অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে নিজের জন্য পদ দাবী করে তাকে পদ দান করা যাবে না' । আরেক হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক এই দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার জন্য নিজ থেকে আগ্রহী হবে-পেতে চাইবে, চেষ্টা করবে আমার মতে সে তোমাদের মধ্যকার সব চাইতে খিয়ানতকারী ব্যক্তি' । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই স্পষ্ট ঘোষণা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচনে নিজে নিজে প্রার্থী হওয়া, প্রার্থী হওয়ার জন্য লবিং করা, দেওয়ালে দেওয়ালে নিজেস্ব চামচা দিয়ে লেখানো 'অমুককে' আমরা আগামীতে প্রার্থী চাই ইত্যাদি হারাম । ইসলামী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ইসলামী নেতৃত্ব নিযুক্ত হবে; 'রাসুল (সা.) এরপর চার খলীফা-খূলাফায়ে রাশেদীন-এর নিয়মানুসারে। আমরা দেখতে পাই যে, জনগণের মত ও সমর্থনের ভিত্তিতে খলীফারা রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাদের একজনও এই পদের দাবীদার ছিলেন না, পদ পাওয়ার জন্য চেষ্টাকারী ছিলেন না, পদ পাওয়ার কামনা-বাসনাও তাঁদের মনে কখনো জাগেনি। সেই সময়ের অবস্থার প্রেক্ষিতে জনগণ তাদের মধ্যে যাকে উপযুক্ত মনে করেছে তাকে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করেছে। এখানে কেউ প্রার্থী ছিলেন না। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জনগণের উপর অবৈধ প্রভু ত্ব করার ইচ্ছেও কারো ছিলো না। তাই তাদের নির্বাচনকে সামনে নিয়ে জনগণকে সত্য-মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্তও করার প্রয়োন পড়েনি। দায়িত্বশীল জনগণ কর্তৃক নিয়োগ বা নির্বাচিত হয়ে তাঁরা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষ এবং আমানতদার-ই শুধু মনে করতেন। তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস ছিলো আল্লাহর বিধানে সকল মানুষ-ই সমান। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'সেই আল্লাহ-ই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। (সুরা ফাতির-৩৯) এই আয়াতে একবচন 'খলীফা' ব্যবহার না করে বরং বহুবচন 'খালাইফা অর্থাৎ খলীফাগণ' ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় গোটা মানবজাতি আল্লাহর খলীফা আর খলীফাদের দায়িত্ব হলো তাঁর প্রতি, তাঁর বিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে সে অনুযায়ী জীবন, রাষ্ট্র, সমাজকে পরিচালিত করা। এ দিকে যাদের যোগ্যতা বেশি হবে তারা দায়িত্বশীল হিসেবে পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র কর্তৃক মর্যাদা পাবে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত পদ, মর্যাদা, কর্তৃত্ব পাওয়ার আশায় কোন কাজ না করে বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর সন্তোষ্টির জন্য তার বিধান অনুযায়ী কাজ করা। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হয়েছে,

১) যে দেশে প্রার্থী হবেন সে দেশের নাগরিক হওয়া।
২) মাতাল বা উন্মাদ না হওয়া।
৩) বয়স ৩৫ বৎসর বা তদুর্ধ হওয়া।

উল্লেখিত যোগ্যতা যাদের আছে তারাই প্রার্থী হতে পারেন। প্রার্থীদের মধ্যে বেশী ভোটের অধিকারীগণ-ই নেতৃত্বের দায়িত্ব পাবেন। বিজয়ী নেতা হতে পারেন অসৎ অযোগ্য, মুর্খ এবং অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, মদ, জোয়া, চোরাচালান, নারীবাজী, মিথ্যাবাদী, চুরি, ডাকাতীসহ দেশ, সমাজও জনস্বার্থ বিরোধী সকল কাজে লিপ্ত। গণতান্ত্রিক পরিভাষায় এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেহেতু জনগণ রায় দিয়েছে তাই তার প্রতি আমাদের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে এবং আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নেতৃত্বের যোগ্যতা এবং অযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার সম্পর্কে গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরাট সংঘর্ষ রয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (সুরা হূদ- ১১৩)। 'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনে আমার স্মরণ থেকে গাফেল, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করলে না। (সুরা কাহাফ- ২৮) 'যে সব লোক সীমালংঘন করে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, শান্তি, শৃঙ্খলা এবং কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে না তাদের নেতৃত্বে ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কখনো স্বীকার করিও না, তাদের মাত্র-ই আনুগত্য করিও না। (সুরা আশশোআরা- ১৫১-১৫২)। হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'অত্যাচারী ইসলামের নির্ধারিত সীমালংঘনকারী রাষ্ট্রনায়কের সামনে স্পষ্ট সত্য কথা বলা সবচেয়ে উত্তম জেহাদ। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রহীম (র.) বলেন, 'এই হাদিস হতে সমালোচনার শুধু অধিকারই প্রমাণিত হয় না, বরং ইহা দ্বারা প্রত্যেক জালিম ও ইসলামের বিরুদ্ধচারী রাষ্ট্রনায়কের যাবতীয় কাজ-কর্মের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট সমালোচনা করা এবং তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা একটি দ্বীনি ফরয বলে প্রমাণিত হয়। এই ফরয যারা ভুলে যায় তারা প্রকারান্তরে

জুলুমেরই সহায়তা করে, ইসলামী হুকুমতের ধ্বংস সাধন করে। শরীয়াতে এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে তাদেরকে 'বোবা শয়তান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত ইহারাই ইসলামী হুকুমতের দুশমন এবং বিশ্বাসঘাতক। (ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা) খলীফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (র.) বলেন, 'আল্লাহ্ কখনও অল্পসংখ্যক লোকের পাপে সকলকে আযাবে নিক্ষেপ করেন না কিন্তু যখন পাপ ও জুলুম প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও কেউ উচ্চারণ করে না, তখন সর্বসাধারণের উপর ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল হয়। মহান আল্লাহ্ পাক স্পষ্ট ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বলে দিয়েছেন, 'যে কঠিন বিপর্যয় তোমাদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র জালিমদিগকেই নয়, সমগ্র মানুষকে গ্রাস করবে, তা হতে সতর্ক হয়ে থাক। জেনে রাখো আল্লাহ্ বড় কঠিন আযাবদাতা। (সুরা আনফাল- ২৫) এরপর অযোগ্য-অসৎ-সীমালংঘনকারী নেতাদের আনুগত্য করার প্রশ্নই আসে না যদিও তারা অধিকাংশের ভোট পেয়ে থাকে। পবিত্র ইসলাম নেতৃত্ব বিষয়ক আলোচনায় যোগ্য নেতার কিছু প্রয়োজনীয় গুণ বর্ণনা করেছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্যে কতগুলি জরুরী গুণের শর্ত আরোপ করেছে। সেই গুণসমূহ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে রাষ্ট্রের নেতা বা প্রধান হিসেবে আনুগত্য স্বীকার করা যাবে। যেমন মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন লোকদের উপর কাফির লোকদের কর্তৃত্ব করার কোন পথ-ই রাখেননি। (সুরা নিসা- ১৪১) এই আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানের জন্যে ঈমানদার হওয়া শর্ত। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্বদান কেবলমাত্র পুরুষদের পক্ষে সম্ভব। তার জন্যও তিনটি শর্ত রয়েছে- (এক) এমন সততা-ন্যায়পরায়নতা-আল্লাহ পরস্তি যা তাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখবে। (দুই) ধৈর্য-শৈর্য, যেন তা দ্বারা সে স্বীয় ক্রোধ দমন করতে পারে। (তিন) যাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তাদের উত্তম নেতৃত্বদান, যেন তারা সবাই তার সন্তান-তূল্য হয়ে যায়'। পবিত্র কোরআন-হাদীসের ভাষ্যনুযায়ী নেতৃত্বের যোগ্যতা হচ্ছে: ঈমানদার সৎ, ন্যায়পরায়নতা, বিদ্যা, ধৈর্যশীল, নিষ্ঠাবান, কর্মঠ, সহানুভূতিশীল, অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী,

আমানত রক্ষাকারী এবং বীরপুরুষ হওয়া। যদি সেই নেতৃত্ব হয় রাষ্ট্রের জন্যে তবে উল্লেখিত গুণগুলির সাথে থাকতে হবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ উত্তমভাবে পালনের যোগ্যতা-প্রতিভা, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তায় থাকতে হবে সর্বাগ্রসর, আইন জ্ঞানে দক্ষতা-পারদর্শিতাও থাকতে হবে, তিনি মানুষের শৃংখল থেকে হতে হবে স্বাধীন, জন্মসূত্রে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, মানবিক এবং উন্নতমানের চরিত্র থাকতে হবে। কোন নাস্তিক-মুরতাদ, বেহায়া, নির্লজ্জ্, মদ-জোয়া-চোরাচালানী, অবৈধ যৌনকামী, বেঈমান, কৃপন, মূর্খ, নির্দয়, অত্যাচারী, অপসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট, ঘুষখোর, দুর্নীতিপরায়ন, নেতৃত্বলোভী, মানবতাবিরোধী ব্যক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বে আসতে পারে না এবং কোন মুসলমান এমন নেতৃ ত্বের প্রতি কখনো আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না। যদি কেউ করে তবে তাদের উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের এই ঘোষণাই যথেষ্ট, ‘যে-কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা’আলার এবং তাঁর রাসুল (স.) এর আইন অমান্য করে এবং তাঁর সীমালংঘন করে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে সেখানে কষ্টদায়ক লাঞ্চিত শাস্তি। (সুরা নিসা- ১৪)

ঈমান

আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যকার মৌলিক বিরোধগুলো মোটামুটি অবগত হলাম। আমরা কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা থেকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারি গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ, একটি জাহেলী মতবাদ। কোন মুসলমান এই মতবাদকে গ্রহণ করতে পারে না। গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। যেখানে আল্লাহ্ তা’আলার সার্বভৌমত্বের প্রতি, আইনের প্রতি, খিলাফতের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে, সেখানে মাথা ডুকিয়ে একজন মুসলমান নিজেকে ঈমানদার দাবী কিভাবে করতে পারে? মুসলমান-তো তাকে-ই বলা হয় যে ঘোষণা করে হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসসহ, ‘আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো প্রভু (ইলাহ) নাই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, চিরন্তন, প্রতিষ্ঠিত এবং সক্রিয়। নিদ্রা কিংবা তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে না। আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই।

তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট কেউ কি কোন কিছুর সুপারিশকে করতে পারে? তিনি মানুষের অতীত ও ভবিষ্যত সব-ই ভালো করে জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্রের কোন একটি জিনিসও তারা আয়ত্ত করতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ নিজে কিছু জানাতে চাইলে (তারা জানতে পারে), তার সার্বভৌম ক্ষমতা আসমান জমিনকে বেষ্ঠন করে রয়েছে, এদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য তাকে কিছুমাত্র ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি উচ্চ ও মহান।' (আয়াতুল কুরসী) যাবতীয় সার্বভৌম ক্ষমতা ও ফরমান দেয়ার নিরংকুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট । 'আল্লাহর নির্দেশ এবং বিচার-ফয়সালাকে কেউ প্রত্যাখ্যান বা প্রতিহত করতে পারে না। তার নিকট কেউ কৈফিয়ত চাইতে পারে না'। হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, মুখ দিয়ে ঘোষণা এবং তদানুযায়ী আমল বা কাজের নাম-ই তো ঈমান। ঈমান শব্দ আরবি, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস। ঈমানের প্রথম ভীত বা প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে: 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' অর্থাৎ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নাই যাকে আমরা সৃষ্টিকর্তা, বিধানদাতা, ইবাদতের মালিক, রিয়কদাতা, উত্তম সাহায্যকারী এবং যার আনুগত্য নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়, যার ইচ্ছের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করা যায়, জীবনের সকল চিন্তা-চেতনা যার কাছ থেকে উৎসারিত, জীবন পরিচালনার সমস্ত নির্দেশনা যার কাছ থেকে নির্ধারিত ইত্যাদি বলে স্বীকার বা গ্রহণ করা যায়। মোট কথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কিংবা কিছু নেই যেখানে আমরা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারি। হযরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার বার্তা বাহক (রাসুল) তিনি আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি মানব জাতির আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর আনুগত্য করাই আল্লাহর আনুগত্যে করা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদীনার মসনদ-ই মানব জাতির জন্য উত্তম এবং শান্তির রাজনৈতিক দর্শন। তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় জীবন পর্যন্ত গড়ে তুলতে হবে। এই কালেমা-ই আমাদের মৌলিক অঙ্গীকার, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মুসলমানীত্ব, আমাদের ঈমান এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি, মুক্তির দর্শন। যারা এই কালিমার অর্থ এবং ব্যাখ্যা বুঝে, হৃদয়ের বিশ্বাস দিয়ে মুখে ঘোষণা করে এবং বাস্তব জীবনে মৃত্যুর দোয়ারে দাঁড়িয়েও তাঁর প্রতিটি আহকাম পালন করে, তাদেরকে-ই বলা হয় মুসলমান বা ঈমানদার। তারা-ই নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করতে পারে। এর বিপরীত পথে যারা চলে তারা ইসলামী পরিভাষায় কাফের, ফাসেক, জাহেল। 'নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। আর যাদের প্রতি

কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধু মাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত; যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিৎ যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহর হিসাব অত্যন্ত দ্রুত। (সুরা ইমরান, আয়াত ১৯) মহান আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের প্রার্থনা।' হে সকল সৃষ্টিজগতের পালন কর্তা মেহেরবান- দয়ালু মালিক 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল-সহজ-সত্য পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছো। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। হে প্রভু কবুল করো আমাদের প্রার্থনা। (সুরা ফাতেহা) কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন মহল থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। ব্যক্তি বিশেষ তাদের দলীয় মানসিকতা থেকে অনেক বাঁকা কথাও বলেছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কিত কোরআন-হাদিসের বক্তব্যের সাথে ঐক্যমতে যারা এসেছেন তাদের অনেকের সাথে দ্বিমতিদের বিক্ষুব্ধ বিতর্কও হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং আড্ডায় এনিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্কের কথাও শোনাগেছে। প্রথম প্রকাশ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত মধ্যখানে দশ বছর সময়। যারা ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করেছেন তাদের নাম উহ্য রেখে এই বিষয়ক বিগত দশ বছরের কিছু প্রশ্নের উত্তর আলোচনার দাবি রাখে। অবশ্য এই প্রশ্ন গুলোর অনেকাংশ অধ্যাপক গোলম আযম সাহেবের 'ইসলাম ও গণতন্ত্র' নামক গ্রন্থে এসে যাওয়ায় আমরা এই গ্রন্থের সূত্র ধরে আলোচনায় এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবো। ইসলাম এবং গণতন্ত্র নিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম দৈনিক ইনকিলাবে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা ২০০৩ খ্রিস্টব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। গণতন্ত্র এবং ইসলাম সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্য হলো; 'প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌম শক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইনসভা'ই সকল ক্ষেত্রে আইন-দাতা। আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিন্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ইসলামে আল্লাহর দেওয়া আইন ও বিধানের বিপরীতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে এ মৌলিক পার্থক্য বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ।' অধ্যাপক গোলাম আযম আরো

লিখেছেন 'গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা। আর বিপ্লব হলো বন্দুকের লড়াই। মনুষ্যত্বের উন্নয়ন বন্দুকের হাতে অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে ত্রুটি আছে। তবে প্রচলিত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে তা কম মন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে দেখতে চাইলে ইসলামের কতক মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমাদের যুবশক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগান থেকে ফিরিয়ে রাখা। এজন্যই ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান উঠেছে। বিপ্লব যদি চাও তবে এসো ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রাসুল (স.) মক্কা বিজয় করেছেন বিনা রক্তপাতে। গোটা আরবে তিনি মনুষ্যত্বের মহাবিপ্লব আনলেন গায়ের জোরে নয়। চরিত্রের বলে৷ এরই নাম গণতন্ত্র'। অধ্যাপক গোলাম আযম আরো লিখেন 'সত্যিকার গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগেই প্রথম চালু হয়। অধুনিক যুগে পাশ্চাত্য থেকে গণতন্ত্র প্রাচ্যে এসেছে। তাদের গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব জোরে-শোরে প্রচারিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসীদের কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন। কিন্তু এটাই গণতন্ত্রের এক মাত্র সংজ্ঞা নয়। 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' কথাটি অবশ্যই কুফরী বক্তব্য। আমরা গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাকে কিছুতেই গ্রহণ করি না। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নিয়মকে কি অস্বীকার করা যায়? যে কোন বিষয়ে সিদ্বান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি বিকল্প কোন পথ আছে? মসজিদ কমিটি থেকে শুরু করে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্বদ্যিালয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যাদের উপর দায়িত্ব থাকে তাদের অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এটাকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা হয়। যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মসজিদ-মাদ্রাসা পরিচালনা করে থাকেন। তাই গণতান্ত্রিক পরিভাষার প্রতি এমন এলার্জি যুক্তিযুক্ত নয়। ইংরেজী এলার্জী শব্দটির অর্থ হলো; যা আসলেই নির্দোষ সে বিষয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তারা যদি গণতন্ত্রের বিকল্প কোন পরিভাষা তৈরী করে দুনিয়ায় চালু করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু কোন বিকল্প পরিভাষা আবিস্কার না করে গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ বলা মোটেও সংগত নয়।' (ইসলাম ও গণতন্ত্র; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রকাশকাল জুলাই ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ) অনেকের জানতে চেয়েছেন 'সত্য যদি গণতন্ত্র কুফরী হয় তবে আমরা মুসলমানরা রাষ্ট্র চালাবো কি দিয়ে? দীর্ঘদিন থেকে আমরা

গণতন্ত্রের কথা শোনে আসছি। তা যে কুফরী, একথা কি পূর্বের এবং বর্তমান আলেম-উলামা বুঝেননি? পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র আর ইসলামী গণতন্ত্রে মধ্যে কোন ব্যবধান আছে বলে আপনি মনে করেন কি? আমি গ্রন্থের শুরুতে গণতন্ত্রের জন্মসূত্র, সংজ্ঞা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং গণতান্ত্রিক দার্শনিকদের ব্যাখ্যাসহ কোরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের মৌলিক বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। প্রশ্ন-উত্তর পর্বের শুরুতে আমাদেরকে একটি কথা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, যদিও গণতন্ত্র অতি প্রাচীন একটি গ্রীক দর্শন কিন্তু তা মুসলিম সমাজে ফিৎনা স্বরূপ এসেছে উনবিংশশতকে। তাই পূর্বের উলামাদের বক্তব্যে গণতন্ত্র বাক্য উচ্চারণ করে প্রতিবাদ না আসলেও গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচুর ফতোয়াহ রয়েছে। একটি কথা কোরআন-হাদিস থেকে শুরু করে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে-তাবেয়ীন এবং সর্বযুগের উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন; মুসলমানদের রাষ্ট্র দর্শনের নাম হলো খিলাফত। মক্কা থেকে হযরত মোহম্মদ (স.) মদিনায় হিজরতের পর যে নীতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন সেই রাষ্ট্রের নীতি অনুসারে রাষ্ট্র গঠনের নাম'ই 'খিলাফাতু আলা মিন হা জিহিন নাবুওয়্যাহ'। এটাই ইসলামী রাষ্ট্র নীতি-ইসলামী রাজনীতির মূল দর্শন। বাকী সব মানুষের মনগড়া, নফসের গোলামী। আজকে যে সকল মুসলমান গণতন্ত্র ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রনীতি খুঁযে পাচ্ছেন না, তাদের ইসলামী জ্ঞানের পরিধি এখানেই বুঝা যায়। হযরত নবী করিম (স.)এর যুগ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের তুর্কী খিলাফত পর্যন্ত এমন একটা সময়ও ছিলো না যে মুসলিম শাসকরা খিলাফত ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করেছেন। সেই সময়ের মুসলিম শাসকেরা যতই অধঃপতনে থাকুন না কেনো তবু তারা তাদের রাষ্ট্রনীতি খিলাফত এবং রাষ্ট্রীয় আইন পদ্ধতি 'শরিয়াহ এ মোহাম্মদ' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। মুসলিম ইতিহাসে হাজ্জাজ বিন ইফসুফের মতো জালেম শাসক পর্যন্ত এই সীমা অতিক্রমের সাহস করেননি। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক শাসক জালেম, শোষক, অত্যাচারী, পাপাচারী ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে খিলাফত এবং রাষ্ট্রীয় আইনে শরিয়াহ ছাড়া অন্য কিছু চলতে পারে তারা কখনো ভাবেননি। মোট কথা হলো; গণতন্ত্র এবং খিলাফত দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতি ভিন্ন আদর্শ। যদি কেউ নিজেকে মুসলমান মনে করেন তবে তিনি রাষ্ট্রনীতি খিলাফত ছেড়ে গণতন্ত্র বা অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি 'মুসলমানদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা খুব দীর্ঘ দিন থেকে নয়, ১৯২৪

খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে তা শুরু হয়েছে। তখন ভারতবর্ষসহ গোটা মুসলিমবিশ্ব ছিলো ইংরেজদের দখলে। সতেরোশতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত মুসলিম ইতিহাসের একটি ক্লান্তিকাল। এই সময়কে আধুনিকযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা। বিশ্বব্যাপি মানুষ আর মানবতা সবচাইতে বেশি নির্যাতিত হয়েছে আধুনিকযুগে আধুনিকতার মুড়লদের হাতে, একথা আমাদের ইতিহাস থেকে স্বীকার করতেই হবে। এই সময় আধুনিকতার পোশাক পড়ে গণতন্ত্র এসেছে আমাদের ভেতরে। তাই আমরা বলতে পারি আধুনিকতা এবং গণতন্ত্র দু'টাই মুলত আমাদের গোলামীর একটি নিদর্শন। গণতন্ত্রের সবকিছু খারাপ তা আমরা বলবো না। তবে মদ কিংবা আফিমের ভেতরের ভালো জিনিস গুলি বিবেচনা করে এসবের বৈধতা কি দেয়া যাবে? তা ছাড়া পূর্বের উলমাগণ এসম্পর্কে বুঝেননি বা বলেননি, তা ভুল ধারনা। যারা ইসলাম সম্পর্কে সামান্যও জ্ঞান রাখেন তারা কেউ গণতন্ত্র জাতীয় কিছুই গ্রহন করেননি। খারেজী এবং মুতাজিলা সম্প্রদায়ের ফিৎনার বিরুদ্ধে, বাদশা আকবরের দ্বীনে এলাহীর বিরুদ্ধে, তাতারীদের ইয়াসার আইনের বিরুদ্ধে, বৃটিশ ঔপনিবেশিতাবাদ যুগে বিভিন্ন ফেৎনার বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ূব খানের পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোর ইসলামী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আলেম সমাজের দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা খোঁজে পাবো তাদের স্পষ্ট বক্তব্য সমূহ। প্রকৃত আলেম-উলামাগণ আজও লড়াই করে যাচ্ছেন মানব রচিত বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্রসহ সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে। বৃটিশরা যখন ভারতবর্ষে তাদের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করেছিলো তখন দিল্লির বিখ্যাত আলেম শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দীসে দেহলভী (রহঃ) ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষনা করে প্রত্যেক মুসলমানের উপর বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজে আইন বলে ফতোয়া দিয়ে ছিলেন? কেনো তিনি 'দারুল হরব' ঘোষণা দিয়েছিলেন? কারণ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর ছাত্র সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)র তাহরিকে মোহাম্মদীয়া সংস্কার আন্দোলন, পেশোয়ার কেন্দ্রিক খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং শেষ পর্যন্ত বালাকোটে তার শাহাদত বরণ ইত্যাদি সবইতো ছিলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য। হাজী শরিয়তুল্লার ফারায়েজী কৃষক-প্রজা আন্দোলন, মীর নেসার আলী তিতুমীরের প্রজা আন্দোলন, মাওলানা কাসেম নানতুবী কর্তৃক দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা,

মাওলানা শওকত আলী-মাওলানা মুহাম্মদ আলী কর্তৃক খিলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠা, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের রেশমী রুমাল আন্দোলন মালটার জেলে দীর্ঘ বন্ধী জীবন, ভারতবর্ষে দীর্ঘ বৃটিশ শাসনের যুগে হাজার হাজার আলেমদের শাহাদত বরণ ইত্যাদির ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারবো যে খিলাফত ব্যতীত অন্য কিছুই পূর্বের আলেম-উলামদের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিলো না। তাই তারা খিলাফতের জন্য আল্লাহর সার্বভৌমত্বের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পিছু হননি। এখন পর্যন্ত প্রকৃত চিন্তক কোন আলেম গণতন্ত্রের পক্ষে ফতোয়া দেননি। বৃটিশরা তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদের যুগে প্রকৃত আলেমদের একটি বিশাল অংশকে জেল-জুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। এখানেই তারা থেমে থাকেনি। তারা মুসলিম সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বকীয়তা ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করে। প্রথমেই তারা বন্ধ করে দেয় মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ওয়াকফ সম্পত্তি ; যে গুলোর আয় দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো চলতো। তারপর তারা ইসলামীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের ঘোষণা না দিয়ে মুসলিম সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্কুল এবং মাদ্রাসায় বিভক্ত করে ফেলে। স্কুলের সেলেবাস সরাসরি ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছিলো। আর তাদের নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা গুলোতে তারা ইসলামী সেলেবাস রেখেছিলো সত্যি, কিন্তু তাদের নিজস্ব মানুষ দিয়ে তারা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। উদাহরণ হিসেবে আমরা কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার কথা বলতে পারি। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ ৭৭ বছর প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্বে ছিলেন ২৭ জন পাদ্রী। নবাবা আব্দুল লতিফ চৌধুরী নামক যে ভদ্রলোককে আমরা বাংলার শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিকদের অন্যতম বলে স্বীকার করে নিয়েছি তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার পরিচালক। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ তাঁর জালালুদ্দিন আফগানী বিষয়ক প্রবন্ধে নবাব আব্দুল লতিফ চৌধুরীকে ইংরেজদের খাস মানুষ বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ বিরোধী সিপাহী জনতার আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর মাওলানা কাসেম নানতুবী কর্তৃক শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দীসে দেহলভীর চিন্তা-চেতনায় স্বাধিনতা-সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনতে তৃতীয় ধারার একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে; এই ব্যবস্থার নাম দারুল উলূম দেওবন্দ। মাওলানা কসেম নানতুবী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী জনতার আন্দোলনের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। আমাদের ইতিহাসের এই সূত্রগুলো

বুঝতে হবে। ভারতবর্ষে হাদিস শিক্ষার অগ্রপতিক শাহ ওয়ালিউল্লাহর ছেলে এবং শিষ্য হলেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবীর শিষ্যদের একজন হলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং অপরজন হলেন মাওলানা শাহ ইসহাক। সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যদের তালিকায় আমরা দেখতে পাই শাহ ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আব্দুল হক এবং আমাদের বাংলার স্বাধিনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক মীর নেসার আলী তিতুমীর শহীদ প্রমূখদেরকে। অন্যদিকে শাহ ইসহাকের শিষ্যদের তালিকায় রয়েছেন মাওলানা আব্দুল গনি মুজাদ্দিদী (র.) এবং মাওলানা আব্দুল গনি মুজাদ্দিদীর শিষ্য হলেন মাওলানা কাসেম নানতুবী (রহঃ)। এই ধারাতেই শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান, মাওলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানী, মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রমূখ। না, তারা কেউ গণতন্ত্রের পক্ষে বলেননি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা করেননি। তাদের সবার সংগ্রাম ছিলো মূলত গণতান্ত্রিক দর্শনের বিরুদ্ধে। ঐ যে ইংরেজদের কর্তৃক দু ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো মুসলিম সমাজে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা মানুষদের কর্তৃক মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন প্রবেশ করতে শুরু করে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নবাব আব্দুল লতিফ চৌধুরী এবং কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এই ধারার চিন্তা থেকে এক দল আলেমও যে বেরিয়ে এসেছেন তা আমাদের চিন্তা রাখতে হবে। পাশ্চাত্যের মন-মানসিকতায় তারা ইসলামের নিত্য-নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে মূলত মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্তির মায়াজালে আটকে ফেলেছেন। উদ্দেশ্যমূলক মায়াজাল বিস্তারের চমক আমাদের অনেকের চোখে বিজলীর মতো ঝলক দিলে আমারা বিভ্রান্ত হই ক্ষণিক আলোর সন্ধানে। আমরা এই বিভ্রন্তির ক্ষণিক ঝলককের নাম দিয়েছি আধুনিকতা। আমরা আধুনিকতা বলে যা ধারন করেছি তাতে অনেক ভালো দিক আছে, কিন্তু এর ভেতরেইতো লুকিয়ে আছে আমাদের কপালের বজ্রপাত-ঘূর্ণিঝড়-ধ্বংসের মহাপ্রলয়। আলেমরা অতীতে যেমন উম্মতকে সর্বপ্রকার ফেৎনা থেকে শতর্ক করেছেন, তেমনি আজও করে যাচ্ছেন। ইসলামপন্থী যারা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন তারাও কিন্তু স্বীকার করে থাকেন যে, যেহেতু পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে বলা হয়েছে সার্বভোমত্বের অধিকারী জনগণ, তাই আমরা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র মানি না, আমাদের গণতন্ত্র ইসলামিক। যেমন মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ ড. ইফসুফ আল কারযাভী লিখেছেন; ‘ইসলামী আন্দোলনের কর্তব্য হলো স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কত্ববাদী

শাসন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার ও জনগণের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। মেকী নয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে আন্দোলনে সোচ্চার হতে হবে। স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে হবে তারা জালেম শাসকদের স্বীকার করে না এবং একনায়কত্ববাদীদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন কি কোন জালেম শাসক সাময়িকভাবে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আন্দোলনের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করলেও।' (ইসলাম: আধুনিক যুগ,কৌশল ও কর্মসূচী, ড. ইফসুফ আল কারযাভী, পৃ:১৪৬) এরপর তিনিই আবার বলছেন; ' অবশ্য কোন কোন ইসলামপন্থী গণতন্ত্রের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। এমনকি গণতন্ত্র শব্দটির প্রতিও তারা সহনশীল নয়। এখানে আমি জোরের সাথে বলতে চাই, ইসলাম গণতন্ত্র নয় আর গণতন্ত্র ও ইসলাম নয়। বরং আমি বলবো অন্য কোন নীতি বা পদ্ধতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতি সবদিক দিয়ে ইসলাম অতুলনীয়। আমি চাই না পশ্চিমা গণতন্ত্র তার খারাপ দিকসহ ইসলামের মাঝে স্থান পাক। আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ যোগ করেই কেবল আমরা আমাদের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে অঙ্গীভূত করতে পারি।' (প্রগুক্ত, পৃ: ১৪৭) ড. ইউসূফ আল কারযাভীর মতো খ্যাতিমান ইসলামী পন্ডিতের গণতন্ত্র সম্পর্কিত বক্তব্যে স্পষ্ট স্ববিরোধিতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেনো তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের ভেতর কোথায় আটকে ছিলেন। আমরা জানি তিনি মিশরের হোসনে মোবারক (যে নিজেই নিজকে ফেরাউন বলে দাবী করেছেন) সরকারের আওয়াকাফ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি ওআইসির ফেকাহ একাডেমী, সৌদী সরকার কর্তৃক পরিচালিত রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী ইত্যাদির সদস্য ছিলেন। তিনি গনতন্ত্রকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তার নিজের দ্বান্দ্বিকতাই প্রমাণিত হয়েছে। গণতন্ত্র ইসলাম নয় এবং ইসলাম গণতন্ত্র নয়, এটা তার নিজের বক্তব্য। তিনি পশ্চিমা গণতন্ত্রকে আমাদের সুবিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করতে চাইলেও পশ্চিমা গণতন্ত্রের খারাপ দিকগুলো ইসলামে স্থান পাক তা তিনি চাননি। আমরা বলতে চাই ইসলাম যদি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হয় তবে অন্য কোথা থেকে কিছু আনার কি প্রয়োজন? তা ছাড়া যেখান থেকে আমরা আনতে যাচ্ছি তাতো ইসলাম থেকে উন্নত কিছু নয়। বরং আমরা নিজেরাই স্বীকার করছি তাতে খারাপ অনেক কিছু আছে।

আমাদের কাছে পরিপূর্ণ ভালো জিনিষ থাকতে আমরা খারাপএবং ভালোর সংমিশ্রন থেকে কেনো ভালো জিনিষ খোঁজে বের করে এনে এখানে যুক্ত করতে যাবো? আমরা যদি সত্যিই গণতন্ত্র এবং ইসলামের সংকরায়নের কথা ভাবি তা হলে কি ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ, কোরআনের এই ঘোষণার প্রতি অস্বীকার হয়ে গেলো না? ড. ইফসুফ আল কারযাভী (র.) একজন প্রাজ্ঞ ইসলামিক পণ্ডিত শুধু ছিলেন না, শেষ জীবনে তিনি মুসলিম উম্মার প্রতি যে দরদ দেখিয়েছেন তা আমাদের মনে তাঁর জন্য বিশাল সম্মানের আসন করে নিয়েছে। তবে তিনি গণতন্ত্র সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে দ্বান্দ্বিকতা স্পষ্ট। এই দ্বান্দ্বিকতা শুধু ড.ইফসুফ আল কারযাভীর মধ্যেই নয়, মুসলমান হয়ে ইসলাম এবং গণতন্ত্রকে যারাই সংকরায়ন করতে চেষ্টা করেছেন তাদের সবার বক্তব্যেই এই দ্বান্দিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যিনি তাঁর অক্লান্ত সাধনায় জামাতে ইসলামীর মতো একটি ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা সংগঠনকে ধাপে ধাপে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে গণতন্ত্রের নীতিতে দাঁড় করিয়ে অতঃপর অবসরে গিয়েছেন, তিনি জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক দীর্ঘকালিন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। গণতন্ত্র ও ইসলাম-এর সংকরায়নের অপচেষ্টায় তিনিও বই লিখেছেন। যদিও ড. ইফসুফ আল কারযাভীর মতো ইসলামী জ্ঞানের জগতে অধ্যাপক গোলম আযমের অবস্থান নয়, তবে তাঁর লেখা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনার দাবী রাখে, যেহেতু জামাতে ইসলামীর মতো একটি সংগঠনের তিনি দীর্ঘদিন আমীর ছিলেন এবং জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের হাজার হাজার কর্মীরা তার কথাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। গণতন্ত্র ও ইসলাম সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমরা তাঁর বক্তব্য থেকে যা পেয়েছি তা হলো ‘গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা। আর বিপ্লব হলো বন্দুকের লড়াই। মনুষ্যত্বের উন্নয়ন বন্দুকের হাতে অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রে ত্র“টি আছে। তবে প্রচলিত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে তা কম মন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে দেখতে চাইলে ইসলামের কতক মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমাদের যুবশক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগান থেকে ফিরিয়ে রাখা, এজন্যই ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান উঠেছে। বিপ্লব যদি চাও তবে এসো ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রাসুল (স.) মক্কা বিজয় করেছেন বিনা রক্তপাতে। গোটা আরবে তিনি মনুষ্যত্বের মহাবিপ্লব আনলেন গায়ের জোরে নয়। চরিত্রের বলে। এরই নাম গণতন্ত্র। সত্যিকার

গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগেই প্রথম চালু হয়। অধুনিক যুগে পাশ্চাত্য থেকে গণতন্ত্র প্রাচ্যে এসেছে । তাদের গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব জোরে-শোরে প্রচারিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসীদের কেউ কেউ গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন। কিন্তু এটাই গণতন্ত্রের এক মাত্র সংজ্ঞা নয়। 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' কথাটি অবশ্যই কুফরী বক্তব্য। আমরা গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাকে কিছুতেই গ্রহণ করি না। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নিয়মকে কি অস্বীকার করা যায়? যে কোন বিষয়ে সিদ্বান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি বিকল্প কোন পথ আছে? মসজিদ কমিটি থেকে শুরু করে মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্বদ্যিালয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য যাদের উপর দায়িত্ব থাকে তাদের অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় । এটাকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা হয়। যারা গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ মনে করেন তার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মসজিদ-মাদ্রাসা পরিচালনা করে থাকেন । তাই গণতান্ত্রিক পরিভাষার প্রতি এমন এলার্জি যুক্তিযুক্ত নয় । ইংরেজী এলার্জী শব্দটির অর্থ হলো; যা আসলেই নির্দোষ সে বিষয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তারা যদি গণতন্ত্রের বিকল্প কোন পরিভাষা তৈরী করে দুনিয়ায় চালু করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে চেষ্টা করতে পারেন । কিন্তু কোন বিকল্প পরিভাষা আবিস্কার না করে গণতন্ত্রকে কুফরী মতবাদ বলা মোটেও সংগত নয়।' (ইসলাম ও গণতন্ত্র; অধ্যাপক গোলাম আযম, প্রকাশনায় আল আযমী পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল জুলাই ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ) অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব স্বীকার করে নিয়েছেন; গণতন্ত্রে ত্রুটি আছে, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য আছে যা বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তিনি একই লেখায় তাও বলেছেন; বিপ্লব দিয়ে মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়, রাসুল (স.) মক্কা বিজয় করেছেন বিনা রক্তপাতে- এর নামই গণতন্ত্র । আবার বলছেন; সত্যিকার গণতন্ত্র খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগেই প্রথম চালু হয় । তা হলে প্রশ্ন হলো যে, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব যে বললেন, হযরত রাসুল (স.) এর রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়ের নাম গণতন্ত্র, তা কি সত্যিকার গণতন্ত্র ছিলো না? আর এটা সত্যিকার গণতন্ত্র হলে খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগেরটা প্রথম হয় কি ভাবে? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্ন নয়, তবে এখানে দ্বান্দিকতার পাশাপাশি সময় জ্ঞানের অসচেতনতা স্পষ্ট । রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সাহেব

হযরত রাসুল (স.) এর রক্তপাতহীন মক্কা বিজয়কে গণতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করলেন; আমরা যদি এটাকে গণ-অভ্যুত্থান বলি তবে কি অধ্যাপক সাহেবের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ হবে? বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি অসংখ্য রক্তাক্ত জিহাদের পর হোদায়বিয়ায় চুক্তির বিনিময় মক্কা বিজয়ের ইতিহাস, তা অধ্যাপক সাহেব গ্রন্থ রচনাকালে ভুলে গেলেও সম্মানিত পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে। অধ্যাপক সাহেব আংশিক হলেও স্বীকার করে নিয়েছেন; পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথাটি অবশ্যই কুফরী। তবে পাশাপাশি গণতন্ত্র বিরোধীদের প্রতি প্রশ্ন করেছেন যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কি কোন বিকল্প আছে? আমরা অধ্যাপক সাহেবের আত্মজীবনী থেকে জেনেছি তিনি বাম রাজনীতি থেকে তাবলিগ জামাত হয়ে জামাতে ইসলামীতে এসে পরবর্তীতে আমীর হয়েছেন। জামাতে ইসলামীর মতো দলের দীর্ঘদিন আমীরের দায়িত্বে থাকার পরও ইসলামের মৌলিক বিষয় খিলাফত এবং শুরা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ, তা বলি কি ভাবে? আমাদের বিশ্বাস তিনির কাছে বিকল্পের জ্ঞান আছে কিন্তু পাশ্চাত্য স্রোতের বিপরীতে সেদিকে নৌকা নিয়ে যেতে সাহস করেননি। আর যদি সত্যই ইসলামের রাষ্ট্রদর্শন খিলাফতের সন্ধান তিনি না পেয়ে থাকেন তবে তা অবশ্যই পরিতাপের বিষয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের জনগণের সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞাকে তিনি নিজেই কুফরী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বলেছেন; আমরা গণতন্ত্রের এই সংজ্ঞাকে কিছুতেই গ্রহন করিনা। তবে 'গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায়?' শিরোনামে এই গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেছেন; আমেরিকার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন গণতন্ত্রের চমৎকার এক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা It is a government of the people by the people and for the people (জনগণের সরকার, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা)।' আবরাহাম লিংকনের এই সংজ্ঞাকে চমৎকার বলে তিনি আবার বলছেন আমরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের জনগণের সার্বভৌমত্বে সংজ্ঞাকে কিছুতেই মানিনা। স্ববিরোধী বক্তব্য আর কি হতে পারে? তা ছাড়া একটি কুফরী দর্শনকে খতনা দিয়ে ইসলামিক করার এতো প্রয়োজন দেখা দিলো কেনো; যেখানে স্বয়ং আল্লাহ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন? অধ্যাপক সাহেব গণতন্ত্র বিরোধীদের এলার্জীর কথা বলার পাশাপাশি এলার্জী শব্দের অর্থটাও বলে দিয়ে আমরা সাধারণ পাঠক সমাজকে উপকৃত করেছেন। তিনির ভাষায় এলার্জী হলো; 'যা আসলেই নির্দোষ সে বিষয়ে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া'। অথচ আমরা তাঁর লেখা থেকে জেনেছি পাশ্চত্যের গণতন্ত্র একটি দোষী

জিনিষ। অধ্যাপক সাহেবরা বিকল্প পথ না পেয়ে তাকে খতনা দিয়ে ইসলামের সাথে সংকরায়নের চেষ্টা করছেন। আর আমরা সামনে কোরআন-সুন্না ভিত্তিক বিকল্প পথ স্পষ্ট থাকায় একটি কুফরী দর্শনকে খতনা দিয়ে ইসলামের সাথে সংকরায়নের বিরোধিতা করছি। আমাদের বিরোধিতা নিশ্চয় অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়, এটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই স্বাভাবিক। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, বৃটিশ বিরোধী রেশমী রুমাল আন্দোলনের নেতা শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.) তাঁর অনূদিত কুরআনুল করীমের টীকায় লিখেছেন 'দুটি জিনিষের নাম ঈমান; সত্যিকার উপলব্ধি এবং অবনত মস্তকে তারই স্বীকৃতি'। আমরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এলার্জীগত কারনে মোটেও নয়, বরং ঈমান থেকে। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা রেখেই বলছিতাঁর এই সব বক্তব্য থেকে একজন পাঠক তাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক হিসাবে যেমন চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হবে, তেমনি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিকও বলতে দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়ে যাবে। তাঁর এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে তাকে সুবিধাবাদী চরিত্রে প্রস্ফুটিত করে দিয়েছে। এই ধরণের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আল্লামা মুহম্মদ মুশাহিদ বাইমপুরী (র.) এর বক্তব্য হলো 'যারা মনে করে ইসলামে রাষ্ট্রনীতি আছে বটে কিন্তু বর্তমানে তা কার্যকরী করবার নয়। কেননা; বর্তমান যুগ তো নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। এরা পরিস্কার ও স্পষ্টতই মুলহিদ ও যিনদীক। ইসলামে ওদের কোন স্থান নাই। ওদের ক্ষতিকর প্রভাব ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য কাফিরদের তুলনায় মারাত্মকরূপে অধিক। যারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওত ও রিসালতের ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাসী তাদের উচিত এ ধরনের মুলহিদ ও যিনদিকদের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা'। তিনি আরো লিখেছেন 'স্বীকৃতির দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাপাকের যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধানাবলী মেনে নেয়া এবং এর সমস্ত হক আদায় করার ঐকান্তিক ও সমর্পিত সুদৃঢ় অঙ্গীকার স্বীকৃতির নামই ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ রবূবিয়তের এটা সেই স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার যা আল্লাহপাক কর্তৃক 'আলাসতু বিরাব্বিকুম' আমি কি তোমাদের রব নই?' উত্তরে 'বালা' 'হ্যাঁ'-এর সময় নেয়া হয়েছিলো, যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে আজও দৃশ্যমান। ইসলামী শরীয়তের প্রতি পরিপূর্ণ ও আন্তরিক স্বীকৃতির দ্বারা আমরা পূর্বেকার কৃত ওয়াদা আরেকবার দোহরাই মাত্র। ইসলামী শরীয়তে যে অঙ্গীকার ছিলো অত্যন্ত

সংক্ষিপ্ত পবিত্র কোরআনে করীমে এবং সুন্নতে নব্বীতে (স.) তো তাই বিস্তারিত দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে ঈমানের দাবিদার হওয়ার অর্থ এটাই যে, বান্দাহ্ আল্লাহ পাকের যাবতীয় হুকুম আহকাম চাই কি তা সরাসরি আল্লাহর সাথেই সম্পর্কিত হোক অথবা মানুষের সাথে, হোক তা দৈহিক প্রশিক্ষণ কিংবা আত্মিক পরিশুদ্ধি 'ইহলৌকিক স্বার্থ কিংবা পারলৌকিক কল্যাণ, ব্যক্তিগত জীবন কিংবা সমষ্টিগত, সন্ধি অথবা যুদ্ধ, সকল ক্ষেত্রেই সে এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হয় যে, সে সকল অবস্থায়ই আপন প্রভুর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে৷ আর আকিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্র যদি হয় একেবারেই শূন্য তথা বিশ্বাস যদি হয় স্রেফ কথার কথা তবে সে সমস্ত লোক নিতান্ত বিভ্রান্ত ও অকাট মূর্খ। তারা কি জানে না যে, কুরআনুল করিম, তফসীর, হাদিসগ্রন্থ, এবং ফিকাহর কিতাব সমূহ যেগুলোকে শরীয়তের প্রমাণপঞ্জী বলা হয় তন্মধ্যে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের জন্য মাত্র কয়েকটি পাতা নিদষ্ট, আর অবশিষ্ট হাজার নয় লাখো পৃষ্টা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনার উপর নিবদ্ধ? এমন কি সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির ভেতরও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়াদির উল্লেখ আছে' । তিনি আরো বলেন 'যারা বলে ইসলামে রাষ্ট্রনীতি আছে বটে, কিন্তু তা বিংশশতাব্দীর প্রয়োজনের তুলনায় মোটেও যথেষ্ট নয়। এই দলটিও কাফের। এদের নিকট ইসলাম যেনো পূর্ণাঙ্গ নয়। অথচ আল্লাহপাক বলেন 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (ইসলাম) পরিপূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা এবং জীবন দর্শন) হিসাবে মনোনীত করিলাম' । বস্তুত ইসলাম আমাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় ও সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের জন্য যেমন অক্সফোডের মুখাপেক্ষি নয়, তেমনি মুখাপেক্ষি নয় কেম্ব্রিজ, হার্ভাড, হাইডেলবার্গ কিংবা প্যাট্রিসলুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়েরও; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ও অনুষ্ঠিতব্য সকল কিছুর সমাধানই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন ও রাষ্ট্রীয় দর্শনে বিদ্যমান।' (মাওলানা মুহম্মদ মুশাহিদ-এর লেখা 'ফতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন'এর অনুবাদ; ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ, ইসলামিক ফান্ডেশন, ঢাকা, পৃষ্টা:৯ থেকে ১৩) বিশ্ববিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'ফী জিলালিল কোরআন'-এর লেখক, মিশরের জালেম সরকার জামাল আন নাসের কর্তৃক শহিদ হওয়া মুফাস্সিরে কোরআন সৈয়দ কুতুব (র.) ওদের সম্পর্কে লিখেছেন 'সে সব ব্যক্তির লেখার ধরণকে

আমরা সঠিক পন্থা বলে মনে করি না, যারা ইসলামী সোশ্যালিজম অথবা ইসলামি গণতন্ত্র ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। অথবা এমনি রূপে যারা আল্লাহ কর্তৃক রচিত জীবনাদর্শ এবং মানব রচিত জীবনাদর্শের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন ও জোড়াতালি দেওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে, তাদেরকেও আমরা পছন্দ করি না' । তিনি আরো লিখেছেন 'কোন বহিরাগত ও অভিনব উপাদানকে তার (ইসলামের) ভেতর স্থান দেওয়ার পরিণামে গোলমাল-ফ্যাসাদ ছাড়া অন্য কোন অবস্থা প্রকাশ পাবার নয়। যেমন মনে করুন একটি পূর্ণাঙ্গ অথচ খুব সূক্ষ কারিগরি শিল্পযন্ত্রের কোন একটি স্থানে যদি বাইরের কোন একটি পার্ট জুড়ে দেওয়া হয় তবে সেই শৃঙখলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়া। ---- এমন অনেক লোক আছেন যাদের চিন্তা-কর্মের গতিধারা ও নিয়মপদ্ধতি অপরিচিত পথিও বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে থাকে যে ইসলামের ভেতর এ সকল বিধান জুড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য নবতর শক্তি সঞ্চয় করে দিয়েছেন। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক ও বাতিল এবং ইসলামের জন্য খুবই মারাত্মক। এটা ইসলামের প্রাণ-আত্মা সম্পূর্ণ অকেজো ও অকর্মা করে দেয়, আর এটি একপ্রকার পলায়নী মনোবৃত্তিবিশেষও; যদিও তা পরিস্কারভাবে স্বীকার করা হয় না।' (ইসলামের সামাজিক সুবিচার, সৈয়দ কুতুব শহীদ, পৃ ২৬৫-২৬৭) গোলাম আযম সাহেবদের আদর্শিক গুরু জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী এসম্পর্কিত বক্তব্য হলো, 'পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতিমালাঃ নিশ্চয়ই সে আধুনিক সভ্যতার ছত্রছায়ায় বর্তমান জীবন ব্যবস্থা, তার বিশ্বাস, আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ গড়ে ওঠেছে তা তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত । সেগুলো হচ্ছেঃ স্যাকুলারিজম, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র' । .....'তৃতীয় নীতিটি গণতন্ত্র তথা মানুষের ওপর খোদায়ী আরোপ-এর নীতি পূর্ববর্তী দু'টো নীতির সাথে একীভূত হয়ে বিশ্বের দুর্দশা ও শান্তিকে নিজের কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকারী চিত্রকে পরিপূর্ণতা দেয় । আমি অবশ্য পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আধুনিক সভ্যতায় গণতন্ত্র অর্থ হচ্ছে সংখ্যাগুরুর শাসন। অর্থাৎ কোনো এলাকার অধিবাসীগণ তাদের সমাজকল্যাণ পূর্ণতাকারী বিষয়ের ব্যাপারে স্বাধীন এবং সে এলাকার আইন তাদের ইচ্ছে থেকে উদ্ভূত।......আর যদি এখন আমরা তিনটি নীতির ব্যাপারে বিবেচনা করি তবে দেখবো যে, স্যাকুলারিজম প্রকৃতপক্ষে মানুষকে আল্লাহর উপাসনা, আনুগত্য, ভয় এবং প্রতিষ্ঠিত আচরণের

নিয়ন্ত্রণবিধি থেকে মুক্ত করছে। পরিণতিতে তারা যেখানে ইচ্ছা বিপথগামী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং অন্য কারো দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে গিয়ে নিজেকে নিজের দাস বানিয়ে নিয়েছে। তারপর জাতীয়তাবাদ এসেছে তাদেরকে আমিত্ব, অহংকার, ঔদ্ধাত্য এবং অন্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষনের মতো মাদকের বড় বড় গ্রাস গিলাতে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গণতন্ত্র এসেছে অন্য সবকিছু থেকে স্বাধীনতা দান করে তাকে নিজের ইচ্ছের কাছে বন্দী করে আমিত্বের আনন্দাবিষ্টে খোদায়ী সিংহাসনে বসাতে। এভাবে তা আইন প্রণয়ন ও তৈরীর পূর্ণ ক্ষমতা তার ওপর ন্যস্ত করেছে এবং তার প্রর্থিত সবকিছু পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তার সেবায় এর সমস্ত সামর্থ্যসহকারে একটি শাসন ব্যবস্থা তৈরী করেছে। তাই আমি মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাষায় বলছি যে, জাতীয়তাবাদী স্যাকুলার গণতন্ত্র আপনাদের গৃহীত ধর্ম ও আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। এতএব আপনারা যদি এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তা হবে আল্লাহর কিতাবকে আপনাদের ত্যাগ করার সমতুল্য, এবং আপনারা যদি তা প্রতিষ্ঠা কিংবা রক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে আপনারা আল্লাহর রাসুল (স.) এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।.....কোথাও এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে আমরা ইসলামকে শ্রদ্ধা করি না এবং যেখানে ইসলাম রয়েছে সেখানে এ ব্যবস্থার কোনো স্থান নেই’। মাওলানা আবুল আলা মওদুদী সাহেবের এই বক্তব্য থেকেও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পাই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের ঈমানগত সংঘর্ষ আছে। গণতন্ত্র গ্রহণ করা মানে আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ করা, রাসুল (স.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। মওদুদী সাহেবের স্পষ্ট বক্তব্য হলো যেখানে ইসলাম সেখানে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। আমরা জানি মাওলানা মওদুদী শেষ জীবনে প্রচলিত রাজনীতির সাথে আপোষ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের কোনো সংবাদ এই পর্যন্ত আমাদের চোখে আসেনি। মাওলানা মওদুদী সাহেবের চিন্তার সাথে তাঁর নিজের এবং নিজ দল জামাতে ইসলামীর কাজে অমিল হয়তো আমরা দেখতে পাই, কিন্তু গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিলো স্পষ্ট। তিনি অধ্যাপক গোলম আযম সাহেবের মতো চিন্তার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এবং ইসলামকে সংকরায়নের ভ্রান্তপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেননি। আরেকটি প্রশ্ন প্রায়ই অনেকের কাছে শোনাযায় যে গণতন্ত্র মতবাদ কুফরী হলে গণতান্ত্রিককে কি কাফের বলা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর নতুন করে দেয়ার কিছু নেই। সারা আলোচনা, বিশেষ করে আল্লামা মুহম্মদ মুশাহিদ বাইমপুরী (র.) বক্তব্য মনদিয়ে পাঠ করলে পাঠকই খোঁজে পাবেন এ

প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আবারো আল্লামা শায়েখ মুহাম্মদ মুশাহিদ বাইমপুরী (র.) এর বক্তব্যকে উল্লেখ করছি। তিনি শেখ ইবনুল হুসাম, হাফিজ ইবনে তায়মিয়া এবং হাফিজ ইবনুল কাইয়িম, শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান প্রমূখ মুসলিম বিদ্বানমণ্ডলির ঈমান সম্পর্কিত বক্তব্য থেকে লিখেছেন 'ধর্মের প্রয়োজনিয় ও অপরিহার্য অংশ যারা প্রত্যাখান করে কিংবা শরিয়তের কোন অংশকে অংশিকভাবে গ্রহণ করে, এমন কি তা যদি একটি সুন্নতও হয়, তবে সে কাফির। কেননা রাসুল করীম (স.) আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছুই এনেছেন, তার সবকিছুই পরিপূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে, সন্তুষ্টচিত্তে ও অবনত মস্তকে মেনে নেওয়ার নামই ঈমান।' (মাওলানা মুহম্মদ মুশাহিদ, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, পৃ:১০ এবং ১১) গণতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় অনেকে নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন নিয়ে আসেন? যদিও গণতান্ত্রিক দার্শনিকদের বেশিরভাগের কাছে নির্বাচনটা হলো গণতন্ত্রের মৌলিক একটি বিষয়, তবে আমরা নির্বাচনের মূল ভিত্তি গণতন্ত্র মনে করি না। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, আধিপত্যবাদ, এমনকি ইসলামও আসতে পারে। একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির সাথে আমাদের দ্বিমত আছে। এই দ্বিমতের কারণ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু নির্বাচন সংগঠিত হয় গণতান্ত্রিক আদর্শ-'জনগণই সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারী' এই নীতির ভিত্তিতে তাই আমরা এই নির্বাচনকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করি। ইসলাম নেতৃত্ব গ্রহনের যে নিয়ম, পদ্ধতি, যোগ্যতা বলে দিয়েছে গণতন্ত্রে আংশিক মানা হলেও ইসলামের মৌলিক বিষয় আল্লাহর 'রাবূবিয়ত' এর সাথে গণতন্ত্রের সরাসরি সংঘাত রয়েছে। ইসলাম যেমন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে না তেমনি সমর্থন করে না রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মানব রচিত কোন মতবাদকে। কোন জালেম শক্তিপ্রয়োগ করে ক্ষমতার মসনদে বসে থাকবে তা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। নেতা নির্বাচন করবে অবশ্যই জনগণ। এই নির্বাচনের পদ্ধতি পরামর্শ সভায় কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমেও হতে পারে, ব্যালেটের মাধ্যমেও হতে পারে। তবে ইসলামের নির্বাচন পদ্ধতির সাথে প্রচলিত কিংবা গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির ব্যবধান আছে, যা আমরা শুরুতে আলোচনা করেছি। যে সব ইসলামী পণ্ডিতদের ফতোয়া নির্বাচনের বিরুদ্ধে তারা মূলত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ফতোয়া দিয়েছেন উম্মতে মুসলিমাকে গণতন্ত্রের ফেৎনা থেকে বাঁচাতে। এই

ফতোয়াকে আমরা যদি বৃটিশ বিরোধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় উলামাদের কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা হারাম ঘোষণার মতো মনে করি তবে বেশি উপকৃত হবো। বর্তমানে কে কি ভাবে ঐ ফতোয়াকে বিশ্লেষণ করছেন তা সবার ইতিহাস জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। তবে ইতিহাস স্বাক্ষী; আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামাদের কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা হারাম ঘোষণা একটি যুগান্তকারী ভূমিকা ছিলো। ইংরেজী ভাষা কেনো? পৃথিবীর কোনো ভাষার সাথেই ইসলামের কোন সংঘাত নেই। ইসলামের বক্তব্য হলো সকল ভাষাই আল্লার সৃষ্টি। ইংরেজী পড়া হারাম ফতোয়াটা ছিলো মূলত একটি প্রতিবাদ, আধিপত্যবাদীদের প্রতি একটু ঘৃণা প্রকাশ এবং স্বদেশীদের ভেতরে যেনো [illegible] মিশতে না পারে সেই ব্যবস্থা। তেমনিভাবে বর্তমানে নির্বাচনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছেন তারা মূলত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির ত্রুটি গুলোর বিরুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন করতে চেষ্টা করছেন। তবে আমরা মনে করি মৌলিকভাবে নির্বাচনের সাথে ইসলামের কোনো সংঘাত নেই। যদি থাকে তবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। নেতৃত্বের জন্য ইসলাম পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছে। শূরা নামে একটি সুরাও রয়েছে পবিত্র কোরআনে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিগত কারনে নির্বচন পদ্ধতিতে কিছু সংস্কার করে গ্রহন করা যেতে পারে। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সংঘাত ঈমান এবং আকিদাগত, আর প্রচলিত নির্বাচনের সাথে পদ্ধতিগত। তাই এই দু'টাকে পৃথক করে দেখা প্রয়োজন। শুধু নির্বাচন কেন্দ্রীক গণতান্ত্রিকদের একটা ভ্রান্ত ধারণা 'গনতন্ত্রের বিরোধীতা মানে বিপ্লব'। আমরা গনতন্ত্রের বিরোধীতা মনে বিপ্লব মনে করি না। আমরাতো গণতন্ত্রের বিরোধীতা করি ঈমান-আকিদা থেকে। গণ মানে মানুষ, তন্ত্র মানে আদর্শ। আমরা আল্লাহর বিধান ছেড়ে মানুষের তন্ত্র মানতে পারি না। এই না মানার নাম ঈমান হতে পারে, দাওয়াতে কালিমুল্লাহ হতে পারে, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হতে পারে। এখানে বিপ্লব পেলেন কোথায়? বিপ্লব অর্থ কি? আরবি ইনকিলাব শব্দের ইংরেজী হলো রেভুল্যাশন এবং বাংলায় বিপ্লব। কোরআন-হাদিসের কোথাও ইনকিলাব শব্দ নেই। অন্যায়-অনিয়ম-জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা আছে। জিহাদ শব্দকে বিপ্লব শব্দে রূপান্তিত করতে যারা দীর্ঘ চেষ্টা করেছেন তারা মূলত ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত লেনিন বিপ্লবের প্রভাবে প্রভম্বিত হয়েছিলেন। এই গ্রুপে সর্বপ্রথম যদি কোনো দলের নাম বলতে হয় তা হলে বলতে হবে জামাতে ইসলামীর কথা। আবুল আ'লা মওদূদী জামাতে ইসলামীর যে দলীয় কাঠামো গড়ে তোলেছেন তা মূলত লেনিনের প্রেলিতারিয়েত দলের অনুকরনে। তেমনি

তিনি ইসলামী ইনকিলাব শব্দটাকেও ধারন করেছেন তারা পাশ্চত্যের বিভিন্ন রেভুল্যাশন থেকে। এই অনুকরনটা ছিলো মূলত মোকাবেলার উদ্দেশ্যে। অধ্যাপক গোলাম আযম নিজেই একথা স্বীকার করেছেন ‘আজ সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমাদের যুবশক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগান থেকে ফিরিয়ে রাখা, এজন্যই ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান উঠেছে। বিপ্লব যদি চাও তবে এসো ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রাসুল (স.) মক্কা বিজয় করেছেন বিনা রক্তপাতে’। (ইসলাম ও গণতন্ত্র; অধ্যাপক গোলাম আযম)। জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের এক সময়ের বিপ্লবী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্য থেকে যদি কেউ বলেন যে, মূলত তারা এক সময় বিপ্লবের শ্লোগান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন, তবে কি তা ভুল হবে? জামাতে ইসলাম যেহেতু বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম একটি প্রধান ইসলামিক দল, তাই এখানে তাদের আলোচনাটা প্রতিকী হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় ইসলামী রাজনৈতিক দলের ভেতরের অবস্থা জামাতে ইসলামীর মতো, আদর্শিক দিকে না হলেও চিন্তা-চেতনা এবং পদ্ধতিগত দিকে। খেলাফত নামে বাংলাদেশে অনেকগুলো সংগঠন থাকার পরও বাংলাদেশে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখনও তেমন শক্তিশালী হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশে খেলাফত নামী সংগঠনগুলোর বেশিরভাগ নেতা-কর্মীর খিলাফত সম্পর্কিত স্বচ্ছধারণা না থাকায় ঐসংগঠনগুলি ‘খেলাফত-খেলাফত’ স্লোগান দিলেও তাদের বেশিরভাগ কর্মপদ্ধতি খিলাফতের সাথে সাংঘর্ষিক গণতান্ত্রিক মানসিকতায় সম্পন্ন হয়। ওরা বিভিন্ন আকাইদ-এর কথা বলে জামাতে ইসলামীর বিরোধীতা করলেও প্রকৃত অর্থে তারা আস্তে আস্তে জামাতে ইসলামীর অনুকরনে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বৃত্তের ভিতর ডুকে যাচ্ছেন। পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রচারিত আধুনিকতা এবং গণতন্ত্র ইত্যাদির গ্রহনের আগে ব্যক্তি, সমাজ এবং ধর্মীয় জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাবটা পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিলো। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে একজন ফরহাদ মজহার গণতন্ত্র এবং আধুনিকতা সম্পর্কে যে সত্যটুকু বুঝতে পারলেন তা অনেক ইসলামী দলের নের্তৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তিরা আজও বুঝতে পারছেন না। ফরহাদ মজহার তাঁর ‘মোকাবেলা’ নামক গ্রন্থে মাকর্সবাদ, নাস্তিকতা, পুঁজিবাদ, আধুনিকতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি দীর্ঘ আলোচনার পর যখন ঘোষনা করেন ‘আধুনিক’ বলতে আমরা যা উপাসনা করি তার মূল যে

স্বর্ণকেশ ও নীলচোখের পাশ্চাত্য বর্ণবাদিতা হাজির রয়েছে সেটা আমরা একদমই ভুলেগেছি। (পৃষ্টা-১৮৩) '----- আমরা এই সকল বিষয়ে সজাগ থেকেই তিনি (জর্মন দার্শনিক হেগেল) কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন খেয়াল করার চেষ্টা করছি এবং বঙ্গদেশে আধুনিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করার একটা জায়গা চাইছি। এতোটুকু অন্তত আমরা বুঝতে পারছি যে আধুনিকতার নানান দার্শনিক ও নান্দনিক ধারা তো অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের যে-পশ্চিমা ধারণা সম্পর্কে আমরা পরিচিত তারও ভিত্তি খ্রিস্ট ধর্ম। '------আধুনিকতার দার্শনিক দিক যেমন বুঝা দরকার তেমনি তার রাজনৈতিক অনুষঙ্গ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের খ্রিস্টিয় ভিত্তিটাও জানা দরকার। (পৃষ্টা ১৯৮) ফরহাদ মজহার যে দরকারটা অনুভব করলেন তা একজন জামাতী কিংবা খেলাফতী চিন্তক কেনো অনুভব করলেন না? ফরহাদ মজহারের বক্তব্য দিয়েই এর উত্তর দেওয়া যায়। তিনি বলেন 'কারণ লক্ষ্য করি, সম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রে বসে যাঁরা দুনিয়া বদলের কথা ভাবছেন তাঁরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবাদ ও হেগেলের খ্রিস্টিয় প্রকল্পের প্রস্তাবনা মেনে নিতে দ্বিধা করছেন না। কেউ বাছবিচার করে গ্রহণ করছেন, কেউবা নির্বিচারে। (পৃষ্টা-২০১-২০২) ফরহাদ মজহারের এই বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে আমরা বলতে চাই এখনও সময় একেবারে চলে যায়নি। ইসলামী গণতন্ত্র এবং আধুনিকতার সাথে ইসলামের সমন্বয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে সঠিক ইসলমের পথে সবার আসা প্রয়োজন। খুঁজে দেখতে হবে গণতন্ত্র আর খ্রিস্ট ধর্মে তফাৎ কি? খ্রিস্ট ধর্ম বলছে যিশু (হযরত ঈসা আ.) আল্লার পুত্র, অর্থাৎ মানুষ রূপে তিনি নিজেই আল্লা। আর গণতন্ত্র বলছে মানুষ সকল সার্বভৌমত্বের মালিক। আমাদের আবার ফিরে যেতে হচ্ছে ফরহাদ মজহারের আলোচনায়। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হলো পাশ্চাত্য থেকে আমরা এসব কর্জ করে আনতে যাবো কেনো 'ইসলামের সুফি ধারার মধ্যে মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' বা আমি সত্য বা আমি আল্লা ঘোষনা আমাদের মধ্যে তেমন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রূপকল্প জাগিয়ে তোলে না। সেটা যদি ইসলামের মূল ধারার বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সম্পর্কের মধ্যে যে নিরন্তর দ্বান্দ্বিকতার ইঙ্গিত নিহিত আছে সেটাও আমরা কোনো দিন ভেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি। এটা একধরণের 'আধুনিকতা'-র ঔপনিবেশিক দিক, অনুকরণপ্রিয়তার ফল এবং পাশ্চাত্য চিন্তার ক্ষতিকর আধিপত্য। কারণ আমরা শিখেছি নিজের ঐতিহ্যের মধ্যে কিম্বা আপন জনগোষ্ঠির ধর্ম বা সংস্কৃতির মধ্যে মহৎ কিছু নাই। (পৃষ্টা-২০৮) ফরহাদ মজহারের কথার মূল লক্ষ্য যদিও

বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা তবে আমরা মনে করি এই কথাগুলোর মধ্যে সার্বজনীন বক্তব্য পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত রাষ্ট্রদর্শন সমূহের মধ্যে একটি আলোচিত বিষয়৷ আমরা আজকের আলোচনা শেষ করবো মহাকবি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা দিয়ে। বর্তমানে যে জ্ঞানীজনরা গণতন্ত্র নামক সোনার হরিণটিকে শিকার করতে হণ্য হয়ে ফিরছেন তাদের প্রতি ইকবালের বক্তব্য হলো 'পশ্চিমের গণতন্ত্র সেতো সেই পুরোনো বাদ্য/ যার তালে সিজারের সুর ছাড়া নাই কিছুই/ গণতন্ত্রের আলকেল্লায় জুলুমের দানব নাচে/ তুমি ভেবো এ হলো স্বাধীনতার সুনীল পরি/ আইন পরিষদ, সংস্কার প্রথা ও অধিকারের ঘুম পাড়ানোর স্বাদ মিটিয়েছে পশ্চিমা এ চিকিৎসা/ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের বক্তৃতায় ফুলঝুরি/ পুঁজিবাদীদের সাজানো আরেক বর্ণিল রণাঙ্গন। / রূপ-গন্ধের এই মরীচিকাকে ভেবেছো ফুলের বাগান/ হায়! ওহে নির্বোধ খাঁচাকে ভেবেছো সুখের নীড়।' (কুল্লিয়াতে ইকবাল, বাঙ্গে দারা, অনুবাদ; মোহাম্মদ ঈসা শাহেদী)। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বেশিরভাগ উদারপন্থী ইসলামিকরা আল্লামা ইকবালকে মনে করেন আধুনিক সময়ের একজন সময়পোযুগি ইসলামী চিন্তক। তাঁদের এই মনে করার সাথে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। ইকবালের দূরদর্শী দার্শনিক চিন্তা ছিলো বলে আমরাও মনে করি। ইকবাল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং ইসলামের গবেষনা শেষে কেনো আর গণতন্ত্রকে মেনে নিতে পারলেন না? কোনো ইকবাল ঘোষনা দিতে বাধ্য হলেন- 'যারা গণতন্ত্রের মধ্যে মুক্তি বা শান্তির নীড় খুঁজেন তারা নির্বোধ'? বাংগালীর জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন যে হাতে পাইত শোভা খর তরকারি/ সেই তরুণের হাতে ভোট ভিক্ষার ঝুলি/ বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! রাজনীতি ইহা- (শিখা কবিতা), আমাদের ইসলামী চিন্তকদের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন৷ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

গণতন্ত্র অবশ্যই একটি ভ্রান্ত পথ, যা একটি কুফর ও শিরকী ব্যবস্থাঃ

প্রথমত : আমাদের গণতন্ত্র (Democracy) শব্দটির উৎস সর্ম্পকে সচেতন হতে হবে। আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে এটা আরবী শব্দ নয়, এটি একটি গ্রীক শব্দ। দু'টি শব্দের

সমন্বয়ে তা গঠিত হয়েছে: 'গণ' (Demos) অর্থ জনগণ এবং 'তন্ত্র' (Cracy) অর্থ হলো বিধান, কর্তৃত্ব বা আইন । গণতন্ত্রের শাব্দিক অর্থ হলো মানুষের দেয়া বিধান, মানুষের কর্তৃত্ব , বা মানুয়ের তৈরী আইন। গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, এটিই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং এ কারণেই তারা এ ব্যবস্থার প্রশংসা করে এবং সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়। একই সাথে, তা কুফর, শিরক, এবং মিথ্যা মতবাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ আপনি জানেন, যে প্রধান কারণে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে কারণে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে এবং নবী-রাসূলগণ প্ররণ করা হয়েছে, আর যে ঘোষণা দেয়া আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, তা হলো আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা। প্রতিটি ইবাদত একমাত্র তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্য সকল কিছুর ইবাদত করা হতে দূরে থাকা। বিধানের অর্থাৎ আইন, বিচার বা শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আনুগত্য যা এক ধরনের ইবাদত তা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য; আর এই আনুগত্য যদি অন্য কাউকে করা হয় তবে মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে । গণতন্ত্র বলে থাকে আইন জনগণের দ্বারা বা অধিকাংশ লোকের দ্বারা প্রবর্তিত হয় যা গণতন্ত্র পন্থীদের সবচেয়ে বড় দাবী। কিন্তু বর্তমানে আইন প্রবর্তনের অধিকার চলে গেছে বিচারকদের হাতে বা বড় নেতা, বড় ব্যবসায়ী ও ধনীদের হাতে, যারা তাদের টাকা ও মিডিয়ার মাধ্যমে সংসদে স্থান করে নেয় এবং তাদের প্রধান উপাস্যরা (রাজা,রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ইত্যাদি) ক্ষমতা রাখে যে কোন সময় ও যে কোন ভাবে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার । সুতরাং, বহু ঈশ্বরবাদের (Polytheism) এক পাশে হচ্ছে গণতন্ত্র এবং অন্য পাশে হলো আল্লাহর সাথে কুফরী করা যা অনেক কারণেই ইসলামের একত্ববাদের, নবী ও রাসূলদের দ্বীনের বিরোধী। আমরা এগুলোর কিছু এখানে উল্লেখ করবো।

প্রথমতঃ এখানে আইন হচ্ছে মানুষের বা ত্বাগুতের, আল্লাহর আইন নয় । আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুম দিয়েছেন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করার জন্যে এবং মানুষের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত না হতে এবং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা থেকে সরে যেতে যেন প্রলুব্ধ না হন। আল্লাহ বলছেন : "কিতাব অবতীর্ণ করেছি

যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুয়ায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সর্তক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে" [সূরা মায়িদা ৫ : ৪৯] । এটাই ইসলামের একত্ববাদ। অথচ গণতন্ত্রে, যা একটি শিরকি জীবন ব্যবস্থা, তার দাসেরা বলে, "তাদের মাঝে বিচার কর যা মানুষের দ্বারা গ্রহীত হয়েছে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর এবং ওদের ব্যাপারে সতর্ক হও যেন ওরা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না করে ওদের ইচ্ছা ও বিধানের দিকে।" তারা এ কথাটি বলে থাকে এবং গণতন্ত্রও তাই বলে থাকে। তারা নিজেরাই বিধান দিয়ে থাকে। এটি একটি স্পষ্ট কুফরী, বহু ঈশ্বরবাদ তথা শিরক, যদি তারা বিধান দেয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। তারা তাদের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে সাজায়, তাদের কার্যকলাপ আরও নিকৃষ্ট; যদি কেউ তাদের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বা তাদের নীতির সাথে এক মত না পোষণ করে বা বিরোধিতা করে তখন তারা বলে, "তাদের মাঝে ফয়সালা কর যেভাবে সংবিধান এবং তাদের বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা চায় এবং ঐসব লোকেদের ঐক্যমত ছাড়া কোন বিধান,কোন আইন ব্যবহার করা যাবে না।"

দ্বিতীয়তঃ তাদের সংবিধানের মতে, আইন বা বিধান দিবে সংসদে নির্বাচিত কতিপয় মানুষ বা ত্বাগুতেরা যারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ করছে। এটা তাদের সংবিধানের কথা, যেই সংবিধানকে তারা আল-কুর'আন থেকেও পবিত্র বলে মনে করে থাকে। তারা এইসব মানব-রচিত সংবিধান বা আইনকে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আল-কুর'আনের দেয়া বিধান বা আইনের উপর প্রাধান্য দেয়। সে জন্যে গণতন্ত্রে কোন শাসন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা তাদের সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত না হয় কারণ তাদের আইনের উৎস হচ্ছে এই সংবিধান। গণতন্ত্রে আল-কুর'আনের আয়াত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ও তাঁর হাদীসের কোন দাম নেই। এটা তাদের জন্যে সম্ভব নয় যে, আল-কুর'আন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুসারে কোন আইন প্রণয়ন করবে যদি তা তাদের 'পবিত্র' সংবিধনের সাথে না মিলে। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে তাদের আইন বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞাস করতে পারেন। আল্লাহ বলেছেনঃ "… অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে

মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে সেটি আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক । এটি সঠিক কর্মনীতি ও পরিণতির দিক দিয়ে এটিই উত্তম।” [সূরা আন্-নিসা ৪ : ৫৯] কিন্তু গণতন্ত্র বলে : “যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দেয় তবে তা সংবিধান, সংসদ,রাষ্ট্রপ্রধান বা তাদের আইনের কাছে নিয়ে যাও ।” আল্লাহ বলেছেন, “অভিশাপ তোমাদের উপর এবং তাদের উপর যাদের তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদত কর। তারপরও কি তোমরা বুঝবে না?” [সূরা আম্বিয়া ২১ : ৬৭]

জনসাধারণ যদি আল্লাহর শরীয়ত গণতন্ত্রের মাধ্যমে বা ক্ষমতাসীন মুশরিকদের আইনসভার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে কখনও তারা তা করতে সক্ষম হবে না যদি ত্বাগুতেরা (রাজা, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট) অনুমতি না দেয়, যদি তাদের সংবিধান অনুমোদন না দেয় – কারণ এটিই গণতন্ত্রের ‘পবিত্র’ গ্রন্থ। অথবা বলা যায় যে, এটা গণতন্ত্রের বাইবেল বা তাওরাত যা তারা নিজেদের খারাপ ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশি দ্বারা কুলষিত করেছে।

তৃতীয়ত : গণতন্ত্র হচ্ছে সেকিউলারিজম -এর নিকৃষ্ট ফল এবং এর অবৈধ সন্তান, কারণ সেকিউলারিজম হচ্ছে একটি ভ্রান্ত মতবাদ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন-কতৃত্ব থেকে ধর্মকে আলাদা করা। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণ বা ত্বাগুতের শাসন; আল্লাহর শাসন নয় কারণ গণতন্ত্রে আল্লাহর আদেশ কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়, যতক্ষণ না তা তাদের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় । এভাবে অধিকাংশ জনগণ যা চায়, অধিকন্তু তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই সমস্ত ত্বাগুতেরা যা চায় তা তাদের সংবিধানের অংশ হয়ে যায়। সুতরাং সমস্ত জনগণ যদি একসাথে হয়ে ত্বাগুতদের ও গণতন্ত্রের উপাস্যদের বলেঃ “আমরা আল্লাহর শাসন চাই,আমরা কোন মানুষকে,সাংসদদেরকে এবং শাসকদেরকে বিধানদাতা হতে দিব না। আমরা মুরতাদ, ব্যভিচারী, চোর,মদ্যপায়ীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর শাস্তি জারি করতে চাই। আমরা মহিলাদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করতে চাই। আমরা পুরুষ ও মহিলাদেরকে তাদের সতীত্ব রক্ষা করতে বাধ্য করতে চাই । আমরা অনৈতিক

অশীলতা,ব্যভিচার, নীতি বহির্ভূত কাজ , সমকামিতা এবং এই ধরনের যত খারাপ কাজ আছে তা প্রতিরোধ করতে চাই।" সে মুহূর্তে, তাদের উপাস্যরা বলবে : "এটা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার ও 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' নীতির বিরোধী!" সুতরাং গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হচ্ছে : আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ও বিধান থেকে মুক্ত হওয়া এবং তাঁর বেধে দেয়া সীমা লংঙ্ঘন করা। নৈতিক বিধানগুলো বিধিবদ্ধ করা হয় না এবং প্রত্যেকে যারা তাদের সাথে একমত হবে না অথবা তাদের দেয়া সীমা রেখা মানবে না, তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। একারণেই, গণতন্ত্র এমন একটা দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা থেকে আলাদা। এটা হচ্ছে ত্বাগুতের শাসন, আল্লাহর শাসন নয়। এটা হচ্ছে অন্য উপাস্যদের (গোলামদের) আইন; আল্লাহর আইন নয়, যিনি একক এবং সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। যে কেউ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করল, সে এমন আইনের শাসন মেনে নিলো যা মানব-রচিত সংবিধানের অনুসারে লেখা এবং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দেয়া শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ঐ শাসন ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিলো।

সুতরাং, কোন ব্যক্তি আইন প্রণয়ন করুক বা নাই করুক, বহুঈশ্বরবাদীয় নির্বাচনে জয়ী হোক বা নাই হোক, কেউ যদি মুশরিকদের সাথে গণতন্ত্রের নীতির বিষয়ে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিচার ফয়সালা করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হয় এবং আল্লাহর কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বের চেয়ে তাদের কিতাব, বিধান ও কর্তৃত্বকে বেশি গুরুত্ব দেয় , তাহলে সে নিজে একজন অবিশ্বাসী (কাফির) রূপে পরিগণিত হবে। একারণেই, গণতন্ত্র অবশ্যই একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত পথ; একটি শিরকী ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং প্রতিটি দল বা গোত্র বিভিন্ন উপাস্য থেকে তাদের উপাস্যকে নির্বাচন করে থাকে যে তার খেয়াল ও ইচ্ছা মতো বিধান দিবে কিন্তু তা হতে হবে সংবিধানের নীতি মোতাবেক। কেউ কেউ তাদের উপাস্যদের (বিধান দাতা) নির্বাচিত করে নিজস্ব মতবাদ বা চিন্তাধারা মোতাবেক; সুতরাং প্রত্যেক দলের নিজস্ব উপাস্য থাকে – কখনও গোত্রভিত্তিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়, যেন প্রত্যেক গোত্রের একেকজন উপাস্য থাকে।

কেউ আবার দাবি করে তারা ‘ধার্মিক উপাস্য’ নির্বাচিত করে, যার দাড়ি আছে অথবা দাড়ি বিহীন উপাস্য বা ইলাহ এবং এমন আরও অনেক রকম। আল্লাহ বলেন : “তাদের কি এমন কতগুলো ইলাহ (উপাস্য) আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই? ফয়সালার (বিচার দিবসের) ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।” [সূরা আস-শূরা ৪২ : ২১]

এই নির্বাচিত এম.পি.রা বাস্তবেই অঙ্কিত, খোদাই করে দাঁড় করানো মূর্তিদের মত উপাস্য যাদেরকে তাদের উপাসনালয়ে (সংসদ ভবন বা দলীয় অফিসে) স্থাপন করা হয়। এই সব প্রতিনিধিরা বা সাংসদরা গণতন্ত্র এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে তাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা রূপে গ্রহণ করে থাকে। তারা সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে থাকে, আইন দেয় এবং এর পূর্বে তারা তাদের সবচেয়ে বড় উপাস্য, সবচেয়ে বড় মুশরিক থেকে অনুমতি নিয়ে থাকে, যে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় তা গ্রহণ বা বর্জনের। এই সবচেয়ে বড় উপাস্য হলো রাজপুত্র বা রাজা বা দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের বাস্তবতা এবং এই জীবন ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ। এটাই হচ্ছে মুশরিকদের দ্বীন, আল্লাহর দেয়া দ্বীন নয়, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীন নয়। এটাই হচ্ছে বহু উপাস্যদের দ্বীন, এক আল্লাহর দ্বীন নয়। আল্লাহ বলেন : “··· ভিন্ন ভিন্ন বহু উপাস্য শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত কর, যেই নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই। ···” [সূরা ইউসুফ ১২ : ৩৯-৪০] তিনি আরো বলেন : “··· আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহ আছে কি? ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে।” [সূরা আন্ নামল ২৭ : ৬৩] কাজেই আপনাকে বেছে নিতে হবে ‘আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন, তাঁর বিশুদ্ধ বিধান, তাঁর দীপ্তিময় আলো ও তাঁর সীরাতুল মুসতাকিম (সরল পথ)’অথবা ‘গণতন্ত্রের দ্বীন এবং এর বহু ঈশ্বরবাদ, কুফরী, এবং এর ভ্রান্ত পথের’ মধ্যে যেকোন একটিকে। আপনাকে অবশ্যই এক আল্লাহর বিধান অথবা মানব রচিত বিধানের মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন : “··· সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ত্বাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান

আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।” [সূরা বাকারা ২ : ২৫৬] আরও বলেন : “বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।’আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি …।” [সূরা কাহফ ১৮ : ২৯]

তিনি আরও বলেন, “তারা কি চায় আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায়অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে ! আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে। বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আলে ইমরান ৩ : ৮৩-৮৫]

ইসলামী আইন ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী আইন ও গনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্ট্রা করা হলোঃ

রসূল (সাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে বা প্রচলিত অন্য কোনো ব্যবস্থাপনাকে মেনে নেননি। নেওয়ার প্রশ্নই আসেনা, কারণ তিঁনি কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে, এ্যারিষ্টটলের কাছ থেকে নয় বা রোমের বাদশাহের কাছ থেকে নয়। তাই ইসলামী রাজনিতী তে গনতন্ত্র মেনে নেয়া যায় না। গণতন্ত্রের জন্মদাতা হলেন এ্যারিষ্টটল এবং তিনি প্রায় আড়াই হাজার

বছর আগে এ ব্যবস্থাপনা তৈরী করেছেন। এরপর তারই পথ ধরে যুগে যুগে গণতন্ত্রের অনেক প্রবক্তা এসেছেন এবং গণতন্ত্রের মূল সূত্র ঠিক রেখে তাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

আল-কোরআন ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যঃ

১) আল-কুরআনঃ "যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।" [২:১৬৫]

গনতন্ত্রঃ জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস।

২) আল-কুরআনঃ "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।" [১২:৪০]

গনতন্ত্রঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগন, সংসদ, মন্ত্রী-এমপির (মদ, পতিতালয় বৈধও হতে পারে)।

৩) আল-কুরআনঃ আল্লাহ তাআলা সার্বভৌমত্বের মালিক। [৩:২৬]

গনতন্ত্রঃ সার্বভৌমত্বের মালিক জনগন।

৪) আল-কুরআনঃ "(হে নবী) আপনি যদি অধিকাংশের রায়কে মেনে নেন তাহলে তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে।" [৬:১১৬]

গনতন্ত্রঃ অধিকাংশের রায়ই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৫) আল-কুরআনঃ "আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। [২:২৭৫]

গনতন্ত্রঃ গণতন্ত্র সূদভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

৬) আল-কুরআনঃ ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। [২৪:২]

গনতন্ত্রঃ সংসদ পতিতালয়ের (যিনা) লাইসেন্স দেয়।

৭) আল-কুরআনঃ সৎকর্ম ও খোদা ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। [৫:২]

গনতন্ত্রঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজের সুনাম ও প্রতিদ্বন্দ্বীর কুৎসা রটায়।

৮) আল-কুরআনঃ মদ, জুয়া, লটারী নিষিদ্ধ। [৫:৯০]

গনতন্ত্রঃ মদ এর লাইসেন্স দেয়। জুয়া, লটারী বৈধ।

৯) আল-কুরআনঃ "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সেতাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [৫:৫১]

গনতন্ত্রঃ কোন সমস্যা নাই। যার সাথে ইচ্ছা (আমেরিকা, ইসরাইল) বন্ধুত্ব কর।এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের হাতে— গনতন্ত্র গ্রহন করবেন নাকি ইসলাম?

"যারা আমার আবতীর্ণকরা বিধান দ্বারা সমাজে বিধান দেয়না বা শাসনকাজ পরিচালনা করেনা, তারাই কাফির, …তারাই জালিম, …তারাই ফাসিক।"(সূরা মায়েদাহঃ ৪৪-৪৬) সুতরাং যারা গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ পরিচালনা করছে তারা কাফির। আর যারা এই কাফিরদের উদ্ভাবিত সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি পরিচলনা করে, সুদ-প্রথা সমর্থন করে, সুদ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত তারাও কুফরী করছে। আর এই কাফিরদের যারা সমর্থন করে তাদের জন্য রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন-"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে তাদের অনুকরণ এবং তাদের মত

হওয়ার চেষ্টা করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।” (আবু দাউদ হাদীস নং ৪০৩১) তার অর্থ এটা দাড়ায় যে যারা বাংলাদেশে গনতন্ত্র চায় ও গনতান্ত্রিক নেতাদের সমর্থন করে তারাও তাদের অন্তর্গত। আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম৷ তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ। (সূরা হা-মীম সিজদাহঃ ২৭-২৮) তোমরা কি ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষে বিশ্বাস কর ও অন্য অংশে অবিশ্বাস পোষণ কর? অতএব তোমাদের মধ্যের যারা এরকম করে তাদের ইহজীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী পুরস্কার আছে? আর কিয়ামতের দিনে তাদের ফেরত পাঠানো হবে কঠোরতম শাস্তিতে। আর তোমরা যা করছো আল্লাহ্ সে-বিষয়ে অজ্ঞাত নন। (সূরা বাকারাহ আয়াত ৮৫) “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করলে কোন মু’মিন পুরুষ কিংবা মু’মিন নারীর নিজেদের কোন ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।” (সূরা আহযাব ৩৬) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে৷ এটিই হল মহা-অপমান। (সূরা তাওবাঃ৬৩)

ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের যে সমস্ত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা হলো, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(১) “আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের মালিক, সার্বভৌমত্ব তারই।” (আল-কুরআন, ৩৫:১৩) “অতএব পবীত্র ও মহান সে আল্লাহ,যিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি।” (আল-কুরআন, ৩৬:৮৩) “তুমি কি জাননা যে, আসমানসমূহ ও যমীনসমূহের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট,তিঁনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই, কোন সাহায্যকারী নেই?” (আল-কুরআন, ২:১০৭) কিন্তু গণতন্ত্রে বলা হয়েছে “সকল সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক জনগণ।”

(২) গণতন্ত্রে দলীয় শাসন থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি দলের লোকেরা শাসন করে। কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্রে বহু দলের উপস্থিতি থাকলেও, কোন দল শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেনা, কারণ এতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুব বেশী এবং আমরা তা বর্তমান ব্যবস্থাপনায় দেখতে পাই। খলিফা (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান) বা জনগণের প্রতিনিধি কোন দলের লোক হলে তিনি দল ত্যাগ করে খলিফা হবেন। দলের সাথে তার কোন সংযোগ থাকবে না এবং তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যথেকে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন।

(৩) গণতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাসক ক্ষমতায় থাকে। কিন্তু ইসলামী খিলাফতে শাসক যতক্ষণ যোগ্যতার সাথে শাসনকার্য পরিচালিত করতে পারবেন ততক্ষণ থাকবেন, তিনি ব্যর্থ হলে ঐ মুহুর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে (খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং খলিফাকে নির্বাচিত করা যেমন ফর্জ তেমনিভাবে তিনি কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হলে তাকে হটিয়ে দেওয়াও ফর্জ দায়িত্ব,যা জনতা ইবাদত হিসেবে পালন করে।)।

(৪) গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের মতামতে একটি আইন পাস হয় এবং তা যেকোন ব্যাপারেই হতে পারে। আইনসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য যদি বলে- মানুষ হত্যা করা উচিৎ তাহলে, তা আইনে পরিনত হবে (ইরাক,ফিলিস্থিন,লেবানন,আফগানিস্থানে নিরপরাধ মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর আগে আমেরিকা, ইসরাইল এবং সহযোগী অন্য দেশগুলোর আইনসভায় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের ভিত্তিতে তা পাস হয় অর্থাৎ নিরপরাধ মানুষ মারার ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয়ভাবে জায়েজ করা হয়, এ ব্যাপারে আপনারা অবগত আছেন)। কিন্তু ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত যদি ইসলামের সুস্পষ্ট আইনের বিরোধী হয় তাহলে তা কখনই গ্রহন যোগ্যতা পাবেনা। তবে এমন কোন ব্যাপার যদি হয়- যার সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই তবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"যারা আমার আবতীর্ণকরা বিধান দ্বারা সমাজে বিধান দেয়না বা শাসনকাজ পরিচালনা করেনা , তারাই কাফির, …তারাই জালিম, …তারাই ফাসিক।"(আল-কুরআন,৫:৪৪-৪৬)

(৫) গণতন্ত্রে জনগণকে শাসন তত্বাবধানের দ্বায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে জনগণের রায় নিয়ে যেই ক্ষমতায় যায়, সমস্ত ক্ষমতা তাদেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত,পরিচালিত হয়,শাসন ক্ষমতার ৪/৫ বছরে জনগণের আসলেই কোন ক্ষমতা থাকেনা। শাসকগোষ্ঠী ভুল করলে বা জনস্বার্থ বিরুদ্ধ কাজ করলে তা সংশোধনের জন্য ৪/৫ বছর অপেক্ষা করতে হয় নির্বাচনের মাধ্যমে আরেকটি ভাল রায় দেওয়ার জন্য এবং সেটি মিস্ হলে বা জনগণ প্রতারিত হলে আবারও ৪/৫ বছর কপাল চাপড়াতে হয়। কিন্তু ইসলামী খিলাফত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি বা খলিফা যে কোনো সময় ভুল করলে সমাজের যে কোন শ্রেণীর লোক সামনা সামনি খলিফার ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, কৈফিয়ৎ নিতে পারে, এমনকি তাকে কটাক্ষ করে কথা বললেও খলিফার কিছুই করার নেই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে রাগান্বিত হয়ে তিনি কিছুই করতে পারেন না। ভুল শুধরাতে ব্যর্থ হলে তাকে তাৎক্ষনিকভাবে বিদায় নিতে হয়।

(৬) গণতন্ত্রে নেতা নিজের চরিত্র সম্পর্কে উত্তম বয়ান করে তাকে ভোট দিতে বলেন এবং তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় অন্য প্রার্থী তার থেকে কোন ক্রমেই ভালো নয় একথা নিশ্চয়তার সাথে প্রচার করেন ও প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে তার গীবত করেন। অনেক সময় তার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ পেশ করেন এবং অন্যায়, কুটিল,অদ্ভুত চাল চালেন যাতে মানুষ তাকে ফেরেশতা এবং তার প্রতিপক্ষকে শয়তান মনে করে। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব চাইলেই - তিনি নেতৃত্ব দানে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন এবং তিনি বাদ পড়েন বা বিদায় হন। রসুল (সাঃ) নেতৃত্ব দাবী করা লোকটিকে বাদ দিয়ে অন্যদের মধ্য থেকে নেতা খুঁজতে বলেছেন, কারণ নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কারনে সে নেতৃত্বের যোগ্যতা হারিয়েছে (একদা দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি এসে রসূল (সাঃ) কে বললেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ ! আমাদেরকে আমাদের এলাকার শাসক মনোনিত করুন। রসূল (সাঃ) বললেন,"আমরা এরুপ ব্যক্তিকে কোন পদে মনোনিত করি

না, যে তার পদ চেয়ে নেয় বা পদের প্রতি লালায়িত হয় ।”(বুখারী শরীফ) আর খলিফা নির্বাচনের পর যদি অন্য কেউ এসে বলে এ ব্যক্তি খলিফা হবার অযোগ্য,আমিই যোগ্য, আমাকে খলিফা বানানো হোক তাহলে রসূল (সাঃ) বলেন- এ লোকটিকে হত্যা কর। কারণ সে ফিৎনা সৃষ্টি করতে চায়,ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা ভয়াবহ । আর খলিফার ব্যাপারটা এমন যে খলিফা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করেন । কুরআন, সুন্নাহ, ইযমা, ইজতিহাদ অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করেন । মৌলিক ক্ষেত্রে নিজের মতামত দিতে তিনি অক্ষম তাই আল্লাহর প্রতি অনুগত মানুষ তার কথায় দ্বিমত পোষণ করেনা বরং আল্লাহর ইবাদতের স্বার্থেই জনগণ খলিফার আদেশ, উপদেশ,নিষেধ মেনে চলে৷ এতে জনগনের ঐক্যে ফাটল ধরার সম্ভাবনা খুবই কম রসূল (সাঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তি যদি আমীরের (রাষ্ট্রের শাসক বা খলিফা) আনুগত্য ছিন্ন করে এক বিঘৎও দূরে সরে যায় এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তাহলে সেই মৃত্যু হবে তার জাহেলিয়াতের মৃত্যু ।’-(মুসলিম শরীফ) খলিফা নির্বাচন নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টির আশংকা কম, কারণ এত কঠিন দায়ীত্ব সাধারনতঃ কেউ নিতে চায় না৷ তাছাড়া এ দায়ীত্বের সাথে বৈষয়িক অনেক লোকসান জড়িত।

(৭) গণতন্ত্রে সরকারী দল – বিরোধী দল থাকে এবং তারা একে অন্যের প্রতিপক্ষ কিন্তু খিলাফতে বহু দলের অস্তিত্ব থাকলেও কোন দল সরকার গঠন করে না। প্রত্যেকটা দলের থেকে মানুষেরা তাদের নিজেদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য,ঈমানদার,আলিম বা উচ্চ শিক্ষিত,উত্তম চরিত্রবান, যেকোন পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন এক বা একাধিক জনকে খলিফা মনোনিত করতে পারেন এবং এরপর নির্বাচন কমিটির (নির্বাচন কমিটির সদস্যরা খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না) কাছে পাঠাবেন। যাকে মতোনিত করা হবে বা নির্বাচিত করা হবে তিনি নিজে এ পদ চাইতে পারবেন না, তবে মনোনিত করা হলে বিশেষ গুরুতর কারণ ছাড়া এ নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। খলিফা কোন দলের হলেও তিনি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। খলিফা হবার আগে দলত্যাগ করেন এবং তার কাছে তখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সমান। এটি খলিফার কাছে ফর্জ ইবাদত তাই প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় অবস্থাতে তার নীতি, প্রচেষ্টা কল্যানকর হবে।

(৮) গণতন্ত্রে শাসক এমন কতৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী হয় যাদেরকে (মানুষ) শাসক ফাঁকি দিতে পারে, আপোস রফা করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে শাসকের সুক্ষ্ম ফাঁকি ধরা সম্ভব হয়না, কারণ সে সীমাবদ্ধ জীব। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে শাসক স্রষ্টা আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার নীতিতে বিশ্বাসী হয় আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল অবস্থা অবগত৷ তিনি মানুষিকতা, বাহ্যিকতা, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছুর হিসাব রাখেন। আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়, এটি খলিফা জানেন,মানেন, কারণ তিনি ঈমানদার৷ তিনি আল্লাহর নিকট কৈফিয়ৎ প্রদানে বিশ্বাসী।

(৯) গণতন্ত্র সমাজে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে- কুরআন ও সুন্নাহ যা পদ্ধতিগতভাবে পুঁজিবাদকে পুরোপুরি খতম করে।

(১০) গণতান্ত্রিক শাসনে সমাজে সরকারী দল, বিরোধী দলের বিরোধ ছাড়াও উঁচু শেণী ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে সরকারী দল, বিরোধী দল থাকে না এবং ধনী ও দরীদ্রের বৈষম্য থাকে না।

(১১) গণতন্ত্রে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তন করে এতে ধনী হয় আরো ধনী, গরীব হয় আরো গরীব। এ ব্যবস্থায় গরীবের কাছ থেকে সম্পদ পদ্ধতিগতভাবে ধনীর হাতে গিয়ে আটকে থাকে। খিলাফতে সম্পদ ধনী ও গবীবের মাঝে আবর্তন করে। ইসলামিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার কারনে ধনীরা গরীবের প্রাপ্য সম্পদ ফর্জ ইবাদত হিসেবে প্রদান করতে বাধ্য থাকে। কতিপয় ব্যক্তি কতৃক নয় বরং রাষ্ট্র কতৃক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, এতে সম্পদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল নাগরিকের কল্যান সাধন হয়।

(১২) গণতন্ত্রে জনগণের সম্পদ ব্যক্তি বা তাদের প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর ব্যক্তির বৈশিষ্ট হলো সে কখনই লোকসান করতে চায় না,যে ভাবেই হোক না কেন সে লাভ করতে চায়। ফলে তাদের লাভের চিন্তা জনগণের অপরিসীম দুঃখ কষ্ট বয়ে আনে। কিন্তু খিলাফতে খলিফা বা শাসক জনতার পক্ষ থেকে তাদের সম্পদের (পানি,বনভূমি,তেল,গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি) সুষ্ঠ ব্যবহার করেন এবং সুষম বন্টন করেন । খিলাফত সরকার যদি হিসাব করে দেখে তারা জনগণকে সরকারী বিভিন্ন সুবিধা, সেবা বিনা মূল্যে প্রদান করতে পারছে, তবে খিলাফত সরকার জনগণকে সেগুলো ফ্রি দিয়ে থাকে। এ সরকার লাভের চিন্তা করে না বরং সেবার দিকটিই প্রাধান্য পায়। শাসক এ কাজটি ইবাদত হিসেবে করেন ফলে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, একাগ্রতার ছাপ থাকে প্রতিটি বৈধ কাজে।

(১৩) গণতন্ত্রে কিছু পুঁজিপতি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারা তাদের লাভের জন্যে কৃত্তিম সঙ্কট সৃষ্টি করে লাভবান হবার চেষ্টা করে। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়,মুনাফাই বিবেচ্য। গণতন্ত্রে এটা বৈধ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদে) শাসকের কিছুই বলার নেই। কিন্তু খিলাফতে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিরুপিত হয়, সরকার ব্যপক ভূর্তুকী দেয় । কতিপয় ব্যক্তি এখানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সরকার এবং পণ্য দ্রব্য মজুদ করে কৃত্তিম সঙ্কট সৃষ্টিকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বন্দোবস্ত রয়েছে। তাছাড়া শাসক জনতাকে আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে সামাজিক,অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এখানে স্বতস্ফুর্ত।

(১৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী, প্রভাবশালী শ্রেণী বেশী সম্পদশালী হবার কারনে এবং গরীবেরা পদ্ধতিগতভাবে বঞ্চিত হবার কারনে সমাজে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয় । বঞ্চিতরা ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের ক্ষোভের বহির্প্রকাশে ধনীরা অধিক পরিমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভূগতে থাকে,মধ্যবিত্তরাও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু খিলাফত ব্যবস্থায় ধনী

লোকেরা গরীবকে সম্পদের ভাগ দেওয়ার কারনে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে ফলে ধনীরা গরীব কতৃক ক্ষতির শিকার হয়না বরং তারাই তাকে নিরাপত্তা দিতে থাকে।

(১৫) গণতন্ত্র তৈরী হয়েছে ইসলাম বিরুদ্ধ চিন্তা চেতনা থেকে এবং এটি কুরআন,সুন্নাহ বহির্ভূত । কিন্তু ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ কতৃক মনোনিত এবং রসূল (সাঃ) কতৃক অনুসৃত। গণতন্ত্র তৈরী হয়েছে সৃষ্ট জীব মানুষের চিন্তা, পরিকল্পনা থেকে অপরদিকে খিলাফত ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা থেকে । যারা বলে ইসলামে গনতন্ত্র আছে তারা ইসলামের ভূল ব্যাখ্যাই করে, ইসলামে কখনো গনতন্ত্র মেনে নেওয়া যায়না, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও গনতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়নি । আর নারী নেত্রীত্বের কুফল, রাসূল (সঃ) এর হাদীস অবমানার ফল, আমারা আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছি । আর যারা রাসূল (সঃ) এর হাদীসের অবমাননা করে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা আর যাই হোক মুসলিম হতে পারেনা। “যখন তোমাদের ধনী শ্রেণী কৃপণ হবে, যখন তোমাদের যাবতীয় কাজে কর্তৃত্ব তোমাদের নারীদের হাতে চলে যাবে, তখন তোমাদের জন্য পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তর ভাগ অধিক কল্যাণকর হবে।” (তিরমিযী) “হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত । যখন নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলো যে, (ইরানী) পারস্যের জনগণ কিসরার কন্যাকে (মেয়ে) তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যে জাতি স্বীয় কাজকর্মের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বভার একজন নারীর হাতে সোপর্দ করে।” (বুখারী ও তিরমিযী)

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন - ব্যবস্থা । যেখানে সমাজস্থ মানুষের জন্য পুরো একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া আছে। আল্লাহ বলছেন, আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সুরা মায়িদাহঃ 5 : 3) উক্ত আয়াতে আল্লাহ দ্বীন বলতে ইসলামকে তাঁর পছন্দের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন । পুরো কোরআন

বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাব যে, সেখানে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা সহ মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন । এমনকি ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে শুরু করে উওরাধিকার সম্পত্তির ভারসাম্যপুর্ণ বন্টন প্রনালী পর্যন্ত বর্নিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে পারেন, Complete Framework for Human societ.

এখন প্রশ্ন হল, আমরা যে গনতন্ত্র নিয়া চিল্লা পাল্লা করছি সেটা অশুদ্ধ বা আল্লাহর বিধান বহির্ভুত কি - না?

উত্তর হচ্ছেঃ অবশ্যই আল্লাহর বিধান বহির্ভুত এবং কুফরী যা কোরআন - সুন্নাহ বিরোধী। এখন কোরআনের আলোকে সেটাই আপনাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্ । আল্লাহ্ কোরআনে বহুবার বলছেন তিনি সর্বময় ক্ষমতার একক মালিক। যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। [2:165]

* তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিন্ধান্ত নেন , তখন সেটিকে একথাই বলেন, ‘হয়ে যাও’ তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। [2:117]

* নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। [3: 165]

* তিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

* যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। [1: 2]

এবং মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। [৯]

* আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [51: 56] বস্তুত এগুলো আমরা সবাই জানি। কিন্তু গনতন্ত্র যে শিরক ও কুফরি এটা জেনেও অনেকে মানতে রাজী নয়।

গণতন্ত্র এসেছে কোথা থেকে আর গনতন্ত্র কি শিখায়? উত্তরটি যদিও সবার জানা তবুও বলছি, গনতন্ত্র এসেছে কাফিরদের কাছ থেকে আর গনতন্ত্র শেখায় যে, জনগণই হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস। অথচ আল্লাহ বলছেন, তিনি - ই সকল ক্ষমতার মালিক। আর এই জনগণ জালিম লোককেও ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাতে পারে যে কিনা ক্ষমতায় এসে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তবুও কি আমরা বলব গনতন্ত্র শিরক - কুফরি নয়? এবার আসি, গনতন্ত্র কিভাবে আল্লাহ্ তা' আলার বিধানকে অস্বীকার করে কুফরিতে লিপ্ত।

* আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছেন এবং সুদের সাথে জড়িতদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। [3:130] আর গণতান্ত্রিক সরকার সংসদে আইন পাস করে সুদের কারবারে লিপ্ত ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স দিয়ে সুদকে বৈধ করে দিয়েছে।

* আল্লাহ্ তা'আলা মদ ও মদের ব্যবসাকে হারাম করেছেন। হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য - নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। [5: 90] আর গণতান্ত্রিক সরকার সংসদে আইন পাস করে মদের ব্যবসাকে লাইসেন্স দিয়ে বৈধ করে দিয়েছে।

* আল্লাহ্ তা'আলা জিনা বা ব্যাভিচারকে হারাম করেছেন।

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। [17 :32]

আর গণতান্ত্রিক সরকার সংসদে আইন পাস করে ব্যাভিচার বা যৌন ব্যবসাকে লাইসেন্স দিয়ে বৈধ করে দিয়েছে।

* আল্লাহ্ তা'আলা ছেলে - মেয়েদের জন্য পৈত্রিক সম্পত্তি বন্টনের বিধান দিয়েছেন।

আর গণতান্ত্রিক সরকার সংসদে আইন পাস করে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানকে অস্বীকার করে নিজেদের মন গড়া বিধান জারি করেছে।

* গণতান্ত্রিক সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগনের অর্থ খরচ করে কাফির- মুশরিকদের অনুকরণ করে ভাস্কর্য/ মিনার নির্মাণ করে সেখানে গিয়ে ফুল পূজা করার, নিরবতা পালন করার ব্যবস্থা করেছে যা কিনা শিরক (শিরক মানে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা)।

* গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় গিয়ে জনগনের অর্থ খরচ করে তাদের প্রিয় নেতা- নেত্রীদের ছবি সমস্ত সরকারী অফিসে টাঙিয়ে ছবি পূজার ব্যবস্থা করেছে।

* 'হরতাল' একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকার যা পালন করতে গিয়ে জনগনের নানারকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়, ক্ষতি হয় জানমালের, আগুন দেয়া হয় সরকারী বা জনসাধারণের গাড়ীতে। অর্থাৎ সমাজে ফিতনা- ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হয় যা কিনা হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে হত্যা করছে। এভাবে একের পর এক চাইলে অনেক অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। যারা বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন এবং জানেন তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

গণতন্ত্রের স্বরুপ ও খেলাফত ব্যবস্থা

মানব রচিত সকল মতবাদ ব্যর্থ বলে প্রমানিত হয়েছে, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম বর্তমানে নিভু নিভু অবস্থায় বেচে আছে, গণতন্ত্রই একমাত্র মতবাদ "যেটা উপরে মিষ্টি, ভিতরে তিক্ত" এখনো মুসলিম জাতিকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে, মিশরে আমরা গণতন্ত্রের নমুনা দেখেছি, রবার্ট ফিক্স নামক একজন বিখ্যাত সাংবাদিক মন্তব্য করেন, "এই ঘটনার পরে মুসলিম জাতিকে ব্যলট বক্সের উপকারিতা বুঝালেও তারা তাতে খুব কমই শুনবে।" বুঝা গেল গণতন্ত্র একটি ধোকা মাত্র, ইউরোপ এর কোনো চর্চা করেনা, গণতন্ত্রে সব মানুষের ভোটাধিকার সমান একথা বলেও তারা এই

গণতন্ত্র মানেনা। অথচ ইসলাম মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব খতম করেছে, আল্লাহ আর বান্দার মাঝখানে কারো নেতৃত্ব কে ইসলাম অস্বিকার করেছে, খলিফা নির্বাচিত হবে কোরআন অনুযায়ী, অর্থাৎ কোরআনের পরীক্ষায় যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তীর্ণ হবে সে হবে খলিফা, জনসাধারণ তাকে নির্বাচিত করতে বাধ্য! ৪ খলিফা এভাবেই নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন নয় যে কারো বাবা কাউকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছিলেন, এমন ও নয় যাকে তাকে ৫১% ভোটের বিনিময়ে রাষ্ট্র প্রধান ঘোষণা করা হয়েছিল।

মানুষ আল্লাহর খলিফা

এই পৃথিবীতে মানুষকেই একমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এই বিশাল সৃষ্টি রাজিতে এই মানুষই স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ও আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে, অন্যথায় সমগ্র স্রষ্টি জগত আল্লাহর আদেশের বাধ্য ও আল্লাহর বন্ধনা করতে ব্যস্ত। এখানেই মানুষের জন্য পরীক্ষা। যেহেতু আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করার শক্তি আর কাওকে দেওয়া হয়নি, এমনকি ফেরেশতারাও নিজেদের ইচ্ছায় কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা। সমগ্র সৃষ্টি জগত কে এই মর্মে আদেশ করা হয়েছে, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। এবার আল্লাহ বলেন: " আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। (সুরা বাকারাহ ২ :৩০)

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (সুরা ফাতির ৩৫:৩৯)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে মানুষকে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি বলা হয়েছে । আমরা প্রত্যেকেই জানি একজন প্রতিনিধির কাজ কি? প্রতিনিধি পাঠানো হয় কেন? বোঝার সুবিধার জন্য বলছি তুলনা করার জন্য নয়ঃ যেমন আমি কোনো কারণে নির্দিষ্ট কাজে অংশ নিতে পারছিনা,

তখনই আমি আমার প্রতিনিধিকে পাঠাই আমার পরিবর্তে কাজ টি সমাধান করতে, এক্ষেত্রে সে অবশ্যই আমার আদেশ মানতে বাধ্য নতুবা সে কিভাবে আমার পরিবর্তে আমার কাজ সমাধান করবে? আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন এই বিশাল আকাশ ও নক্ষত্র রাজি, সমগ্র বিশ্ব জগত ও প্রকৃতির অবদান সকল মানুষের প্রতি সমান। একটি আম গাছকে লক্ষ্য করুন, সে কি তার ফল দিতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করেছে? সে কি গরিব কে টক ফল আর ধনী কে মিষ্টি ফল দান করেছে? এটা এজন্য যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না করার জন্য যার কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই মানুষের মত।

ঠিক এটাই মহান আল্লাহ মানুষের কাছে চান বলে আসমানী কিতাব গাইড লাইন হিসেবে দিয়েছেন এবং নবী -রাসুলগনকে নেতা ও বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন সেই কাজ কিভাবে করতে হবে। যেহেতু মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে তাই আমরা আল্লাহর আদেশ ইচ্ছে করলে মানতে পারি অথবা নাও মানতে পারি। যেমনঃ প্রকৃতি আল্লাহর আদেশ মানে বলেই আপনি তাতে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবেন না। আল্লাহ বলেন: আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি -যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন , তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। সুরা মায়িদাহ ৫:৪৮ এটাই আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর আদেশ।

খেলাফত কি?

এই খলিফা শব্দ টি থেকেই খেলাফত শব্দটির উৎপত্তি। খলিফার কাজকেই খিলাফত বলা হয়। অতএব পৃথিবীতে মানুষের সার্বিক জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত চুড়ান্ত বিধান কোরআনের আলোকে পরিচালিত করার নাম-ই খিলাফাত। সুতরাং খেলাফাত ব্যবস্থায় নির্বাচন পদ্বতি হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন, তার শাসন পদ্ধতি হবে কোরআন অনুযায়ী, তার রাষ্ট্রের প্রত্যেক স্তর ও অঙ্গ সংগঠন আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হবে। সুদ প্রথা, মদ, মানুষের তৈরী বিচার -ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে এখানেই তার সাথে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র অথবা অন্য সকল মতবাদের সংঘাত।

খিলাফত ব্যবস্থার উজ্জল দৃষ্টান্ত ৪ খলিফার শাসনাকাল

ইসলামের জন্ম লগ্ন থেকেই এই চার খলিফা তাদের ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে আসছিলেন, এবং ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁরা ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্টত্বের চূড়ান্তে আরোহন করতে পেরেছিলেন। তাদের কারো মনে খিলাফতের নুন্যতম আশা ও ছিলনা, প্রত্যেককে জোর করে এই আসনে বসানো হয়েছিল, অতএব তাদের শাসনামলে তারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এভাবে, যেমন আল্লাহর রাজত্বে সাগর তলের একটি মাছ ও উপোস থাকেনা, ৪ খলিফার শাসনামলে তাদের রাজ্যে একটি কুকুর ও না খেয়ে থাকতে পারতনা।

চার খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি

রাসুলের ওয়াফাতের সময় তিনি কাউকে নির্বাচিত করে যাননি, আবু বকর (রাঃ) এর মর্যাদা, তাঁর প্রতি রাসুলের অগাধ ভালবাসা ও তাঁর অসুস্থতার সময় নামজের দায়িত্ব পালনকারী আবু বকর (রাঃ) কে সংগত কারণেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হিয়েছিল, রাসুলের সুদীর্ঘ ২৩ বছর নবুয়াতি জিন্দেগীতে তাঁর মর্যাদা ও ইসলামের প্রতি তার দায়িত্ব বোধ আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাসুল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রাঃ) এর চেয়ে ইসলামী বিশ্বে যোগ্য উত্তরসুরী আর

কেউ ছিলনা। আবু বকর রাঃ মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ) কে নির্বাচিত করে যান। আবু বকর (রাঃ)এর পরে ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন। সমস্ত মুসলমান গণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। অতপর উমর (রাঃ) আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হলে তিনি ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিঠি গঠন করেন, উল্লেখ্য, তাঁরা সেই যুগের সব চাইতে বেশি ইসলামের ধারক বাহক ছিলেন। তাঁরা সমস্ত মুসলিম জাহানের সাথে পরামর্শ করে ওসমান (রাঃ) কে নির্বাচিত করেন। তিনি খারেজি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে তখন আলী (রাঃ) এর প্রতিদ্বন্দ্বী কেও ছিলনা, অতএব তাঁকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। সমগ্র মুসলিম জাহানের ঐক্যমতে আলী (রাঃ) এর পরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে খেলাফাত ব্যবস্থা ম্লান হতে লাগল। উল্লেখ্য যে, আমিরে মুয়াবিয়ার শাসনামলে ও ইসলামের স্বর্ণযুগ অব্যাহত ছিল, কিন্তু তাঁর নির্বাচন পদ্ধতিতে ইসলামী শরিয়া বোর্ড ও মুসলিম জনগনের অকুন্ঠ সমর্থন ছিলনা বলেই "খলিফা" থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় “আমির” । পরবর্তিতে তাঁর পুত্র ইয়াজিদের ক্ষমতায় আরোহনের মাধ্যমে খিলাফাত ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। আর এখান থেকে শুরু হয় বিপথগামী রাজতন্ত্র শাসনব্যবস্থা।

অতএব এ থেকে কিছু জিনিস লক্ষ্য করা যায়:-

(১) চার খলিফা ইসলামের ধারক বাহক ছিলেন।

(২) কোরআন ছিল তাঁদের চালিকা শক্তি।

(৩) যে কেউ মন চাইলে টাকা বা পেশি শক্তির জোরে এখানে প্রার্থী হতে পারেনি, ইসলামী সর্বোচ্চ বোর্ড যাদের কে মনোনয়ন দিয়েছিল তারাই মূলত প্রাথী হতে পেরেছিল।

(৪) খলিফা গনের একে অপরের মধ্যে নুন্যতম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলনা। শ্রেষ্টত্বের মানদন্ডে যিনি উত্তীর্ণ হয়েছিল তাকেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করা হয়েছিল। এখানেই

রাজতন্ত্রের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। (বর্তমানে যারা সৌদি শাসকদের ইসলামের ধারক বাহক মনে করে তারা আসলেই বিভ্রান্তিতে আছে)

(৫) এই পর্যায়ে এসে খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল, খলিফার হাতে হাত রেখে প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি শপথ করা যে, আমরা ততক্ষণ আপনার আনুগত্য করব যতক্ষণ আপনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করেন।

এই পদ্ধতি এমন ছিলনা যে নির্বাচিত করে একজনকে বসিয়ে দিলাম, সে যা করে পরবর্তিতে সব কিছু আমাদের মানতে হবে, এখানে একজন খলিফাকে প্রতিদিন জনগনের কাছে পরীক্ষা দিতে হত, সরাসরি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত, শুধু তাই নয় হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে একজন গভর্নর নিরীহ এক ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে বেত্রাঘাত করেছিল বলেই ঐ গভর্ণরের উপর লক্ষ লক্ষ হাজীদের সামনেই ঐ নির্যাতিত ব্যক্তিকে প্রতিশোধ নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন উমর (রাঃ)।

খিলাফত ব্যবস্থায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পদের হিসাব নিকাশ জনগনের কাছে উন্মুক্ত ছিল। শাসকগন জনগনের কল্যানে ব্যস্ত ছিলেন। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করতেন।

গণতন্ত্র কি?

গণতন্ত্রের প্রবক্তা আব্রাহাম লিঙ্কন এর মতে : **It is a government of the people by the people and for the people** এটি একটি জনগনের সরকার , জনগনের জন্য ও জনগনের মাধ্যমে নির্বাচিত। আপাতত দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত সুন্দর সরকার ব্যবস্থা বলে পুরো পৃথিবীতে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্যতা পায়। কিন্তু কেউ এই গণতন্ত্র পুরাপুরি মানেনি। গণতন্ত্রের ধারক বাহক আমেরিকা সর্ব প্রথম এই নিয়মের চরম লঙ্ঘন করেছে, তাদের দেশে যে কেও প্রার্থী হতে পারেনা,

দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বোর্ড কর্তৃক কাইকে প্রার্থী হিসাবে পছন্দ করা হলেই কেবল সে প্রার্থী হতে পারে। অতএব সাধারণ জনগনের ভোট পাওয়ার পর তাকে আবার সেই বিশেষ বোর্ড কর্তৃক নির্বাচনে জয়ী হতে হয়। অতএব সে প্রেসিডেন্ট হতে পারে। এটাকে তারা প্রত্যক্ষ ভোট বলে। সুতরাং লিঙ্কনের মতবাদ জনগনের মধ্যে ২ ভাগে ভাগ হয়ে গেল। (১) বিশেষ জনগণ (২) সাধারণ জনগণ সাধারণ জনগণ এর ভোটের পর বিজয়ী প্রার্থীকে আবার বিশেষ জনগনের ভোটের মোখুমখি হতে হয়। যেই বিশেষ জনগনই ইতিপূর্বে প্রার্থী নির্বাচন করেছিল। এই বোর্ড দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে অতপর দেখা যায় এই বোর্ডই মূলত নির্বাচনে কলকাঠি নাড়ে, সাধারণ জনগণ নয়৷ ফলে আমেরিকা তে সরকার পরিবর্তন হলেও কখনো নীতির পরিবর্তন হয়না। দ্বিতীয় নির্বাচন পদ্ধতি হল, প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে; যেখানে মানুষ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে৷ যেটা বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে প্রচলিত।

গণতন্ত্র একটি বাস্তববিরোধী মতবাদ

বর্তমান রাজনীতিতে গণতন্ত্রের রমরমা বেশ তুঙ্গে। গণতন্ত্র ছাড়া যেন রাজনীতিই হয় না। অথচ এই গণতন্ত্র হল সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী একটি মতবাদ। এককথায় বলতে গেলে গণতন্ত্র ও ইসলাম দুটি বিপরীত মেরু। আর গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেই অর্থে গণতন্ত্র কোনদিনই সম্ভব নয়। কেননা,

১) গণতন্ত্রে বলা হয়েছে, এ হল জনগণের শাসন। অথচ যে কোন রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জয়ী হবার পর জনগণের কথা একেবারেই ভূলে যান। তখন আর জনগণের কিছুই করার থাকে না। পাঁচ বছর সেই শাসকগোষ্ঠীকে নির্বিচারে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। জনগণ পাঁচ বছরের আগে সেই শাসকগোষ্ঠীকে হটাবার সুযোগটুকুও পান না।

২) অপরদিকে দেখা যায়, দেশের অধিকাংশ জনগণ কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন না করলেও নির্বাচনে জয়ী হয়। যেমন, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে দেশের প্রায় ৭০% শতাংশ জনগণ ভোট দেননি অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ লোক চাননি মোদী প্রধানমন্ত্রী হোক তবুও মোদী সরকার একচেটিয়াভাবে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে এবং মোদীজী প্রধানমন্ত্রী হন। যা হল গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ অভিশাপ। অথচ গণতন্ত্রের বর্তমান সংজ্ঞায় বলা হয়েছে গণতন্ত্র হল, জনগণের শাসন, কিন্তু বাস্তবে এতে জনগণের মতামতকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়।

৩) বর্তমান গণতন্ত্রে জোট হল রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই জোটের মাধ্যমে কোন কোন রাজনৈতিক দল অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে ক্ষমতায় আনতে পারে। অথচ দেখা যায় কোন দলের লোক কোন একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। অথচ দেখা গেল যে দলটিকে সে সমর্থন করে সেই দল এমন একটি দলের সাথে জোট করেছে যা সেই ব্যাক্তির পছন্দ নয়। তবুও দেখা যায় যে নিজের পছন্দনীয় দলের প্রার্থী না থাকায় জোটের দলের অপছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হতে হয় বা অনেক সময় নিজের প্রার্থীকে না পাওয়ায় জোটপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া সম্ভব হয় না বলে অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে হয়। উদহারণস্বরুপ বলা যায়, এই ২০১৬ সালের পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেস জোট করে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করার জন্য। এখানে দেখা যায়, যেখানে সিপিএমের প্রার্থী ছিল সেখানে কংগ্রের প্রার্থী দাঁড়ায় নি। জোটের খাতিরে। ফলস্বরুপ, অনেকে যারা কংগ্রেসের সমর্থক ছিল তারা অধিকাংস সিপিএম বিরোধী ছিল। আর অনেক সিপিএম সমর্থক ছিল যারা কংগ্রেস বিরোধী ছিল। কিন্তু যখন সিপিএম ও কংগ্রেসের জোট হয় তখন সেই সমর্থকেরা একে অপরকে ভোট দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তখন জনগণ বাধ্য হয়ে জোটের প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে অনেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে দেয়। অথচ এরাই চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে কিন্তু জোটের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস বাজিমাত করে বিপুল ভোটে জয়ী হয়। যা হল গণতন্ত্রের এক কালো দিক।

৪) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে ভোট বহু অংশে ভাগ হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন জনমতের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ভোট ভাগ হয়ে যাবার ফলে শাসকগোষ্ঠী লাভবান হয়।

৫) গণতন্ত্রে যে কোন ব্যাক্তি যে কোন প্রতীক চিহ্ন চয়ন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যাক্তিরাও যে কোন ঝান্ডা নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যায় এবং অনেকক্ষেত্রে জয়ী হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় প্রার্থী নিজের নাম সহি করতে পারে না কিন্তু জনগণের সমর্থনে সে জয়ী হয়। যা গণতন্ত্রের কালো দিক।

৬) গণতন্ত্র হল এক ধরণের মুর্খে শাসন। কেননা দেশের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত। এই অশিক্ষিতরা দেশের শাসক নির্বাচনের যোগ্যতা রাখে না। তবুও এদেরকে নির্বাচনে সুযোগ দেওয়া হয় এবং ইচ্ছামত শাসক নির্বাচনের অধিকার রাখে। সুতরাং মুর্খরাই মুর্খ শাসককে নির্বাচিত করে যা আদৌ কাম্য নয়। উদাহানস্বরুপ বলা যায়, অনেক সময় সিনেমার অভিনেতা, অভিনেত্রীরা রাজনীতির কিছুই বোঝে না। তারা নিজেদের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে নেমে পড়ে। আর জনগণ নিজেদের পছন্দের অভিনেতা অভিনেত্রীকে ভোট দিয়ে জয়ী করেন। যেমন, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী, শতাব্দী রায়, দেবশ্রী সরকার, অভিনেতা দেব, চিরঞ্জিত, তাপস পাল, সোহম প্রভৃতিদেরকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে বাজিমাত করার চেষ্টা করা হয়। আর জনগণ কিছুই না বুঝে এদেরকে ভোট দেয়। যা গণতন্ত্রের নামে চরম পরিহাস।

৭) গণতন্ত্রে কখনো প্রত্যেক প্রার্থী নিজের ইচ্ছামত শাসক নির্বাচন করতে পারে না। কেননা, ঘরের একজন ব্যাক্তি যদি কোন প্রার্থীকে ভোট দেয় তাহলে তার বাড়ি প্রত্যেক সদস্যই সেই প্রার্থীকেই ভোট দেয়। ফলে বাড়ির একজনের ভোট দেওয়া আর সকলের ভোট দেওয়া একই ব্যাপার। এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের কোন মূল্যই থাকে না।

৮) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো আত্নীয় যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে সকলেই নিজের আত্মীয়কে ভোট দিয়ে সমর্থন করে। এক্ষেত্রে আত্মীয়রা জানে যে সে ব্যাক্তি প্রার্থী হিসেবে একেবারেই অযোগ্য। তবুও আত্মীয়তার খাতিরে ভোট দিয়ে সমর্থন করে। যদি অত্মীয়কে ভোট না দেওয়া হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয় এবং রক্তক্ষয়ী লড়াইও শুরু হে যায় এক্ষেত্রে গণতন্ত্র আর বাকি থাকে না।

৯) গণতন্ত্রে বিরোধী দলের জনগণকে বহু রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে শাসক দলের সমর্থকরা বিপুল পরিমাণে লাভবান হয় এবং বিরোধীরা অতলে তলিয়ে যায়। যেমন, ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী পক্ষের লোকদেরকে সরকারী তরফ থেকে ঘর দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে। এর আগেও বাম জামানায় সিপিএমের নেতারা বিরোধীপক্ষের লোকেদের বহু রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। যা গণতন্ত্রের এক অভিশাপ।

১০) বাস্তবে গণতান্ত্রিক দেশে নেতাগিরি আর গুন্ডাগিরি যেন একই মায়ের দুই জারজ (হারামী) সন্তান। এখানে কোন নেতাই গুন্ডাগিরি না করে টিকতে পারে না। ভারতে বিজেপির যেকোন নেতাই দেখুন দিনের পর দিন গুন্ডাগিরি করেই তারা রাজনীতিতে বিস্তার লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মন্ডল তো পুলিশকে বোমা মারার হুমকি দিয়েছেন, আর নদীয়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা (বাংলা সিনেমার অভিনেতা) তাপস পাল তো মানুষের ঘরে আগুন লাগাবার এবং মহিলাদেরকে ধর্ষন করারও হুমকি দিয়েছেন। লাভপুরের মনিরুল ইসলাম তো জর্জদেরকেও হুমকি দিয়েছেন। গণতন্ত্রের এর থেকে বড় অভিশাপ আর কি হতে পারে?

১১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় জনগণ সেই সরকারকেই ভোট দেয় যে সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী দেখা হয় না। এতে প্রার্থীরাও সুযোগ পেয়ে যায় এবং জনগণকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে, ভূয়া সাহানুভুতি দেখিয়ে, প্রতিশ্রুতি

দিয়ে জনগণের সাহানুভূতি অর্জন করে। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর তারা কোন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে না। যেমন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অবৈধ উপায়ে যত কালো টাকা উপর্জন করে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা করা হয়েছে তা ফিরিয়ে আনা হবে এবং দেশের প্রতিটি জনগণকে মাথা পিছু ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। জনগণ মোদীজীর এই প্রতিশ্রুতিতে খুশি হয়ে উক্ত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করায়। কিন্তু মোদীজী তাঁরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি এবং বিদেশ থেকে কালো টাকাও ফিরত আনেন না এবং জনগণের মাথাপিছু ১৫ লক্ষ টাকাও দেননি। উলটো মোদী সরকার করেছে কি দেশের যেসব ব্যাক্তি অবৈধ উপায়ে কালো টাকা উপার্জন করেছে তাদেরকে আদেশ দিয়েছে যে, সেই টাকার ৪৫% ট্যাক্স দিয়ে বৈধ বানিয়ে নিক। এক্ষেত্রে সরকার দেখবে না যে সেই টাকা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে। চুরি করেছে, না ডাকাতি করেছে, না ব্ল্যাকমেইল করে কারো টাকা আত্মসাৎ করেছে, না ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে উপার্জন করেছে, না স্মাগলিং করেছে, না কালোবাজারী করে টাকা উপার্জন করেছে।

সুতরাং গণতন্ত্র হল এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে জনগণকে বোকা বানানো হয় এবং একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে জনগণের মাথায় বেল ভেঙ্গে খাওয়া হয়।

১২) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় একটি দল অন্য দলের ব্যাপারে সবসময় বিষোদগীরণ করে থাকে। সবসময় একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে থাকে। বিরোধী দলকে জনগণের সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা অপবাদ অভিযোগ করে থাকে। অনেক সময় বিরোধী পক্ষের নেতাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পর্যন্ত পাঠানো হয়। আর নিজেদের দোষত্রুটি গুলো গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী নেতারা কতকগুলি ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে প্রচুর হাঙ্গামা করে এবং তৃণমূলের ভাবমূর্তীকে জনসম্মুখে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে। সেই ভিডিওতে দেখানো হয়েছিল তৃণমূলের কয়েকজন নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিচ্ছেন। এই ভিডিও ফুটেজের ঘটনাটি 'নারদা

কান্ড’ নামে পরিচিত। ভিডিওর সত্য মিথ্যার ব্যাপারে কিছু বলছি না। ঐ নেতাদের ঘুষ নেওয়ার ব্যাপারটা সত্যও হতে পারে। তবে বিরোধী পক্ষ ভিডিও নিয়ে প্রচার-অপপ্রচার করল কবে ? নির্বাচনের ঠিক কয়েকমাস আগে থেকে। অথচ এই ভিডিও কয়েক বছর আগেকার। তাহলে নির্বাচনের ঠিক কয়েকমাস আগে থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেন বিরোধী পক্ষ কোমরে গামছা বেঁধে ময়দানে নামলেন কেন? কারণ তৃণমূলকে জনগণের সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করে মানুষের কাছে সমর্থন লাভ করাই ছিল বিরোধী পক্ষের মূল উদ্দ্যেশ্য।

এই হল বর্তমান গণতন্ত্রের নমূনা। এখানে বিরোধী পক্ষ যোগ্য হলেও তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয়। কুৎসা রটনা না করলে জনগণের সাহানুভুতি অর্জন করা যায় না এবং রাজনীতিতে বাজিমাত করা যায় না।

১৩) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় সবসময় ধর্মকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়। এখানে কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহানুভুতি অর্জনের জন্য ছলচাতুরির সাহায্য নিয়ে তোষনমূলক রাজনীতি করা হয়। অনেক নেতা-নেত্রী আছেন যাঁরা ভূলভাল জায়গায় “খোদা হাফেজ-ইনশাআল্লাহ বলতে বেশ পটু। দেখা গেছে তাঁরা সারাদিন খাওয়া দাওয়া সেরে ঢেকুর তুলতে তুলতে ইফতার পার্টিতে যোগদান করেছেন। হজের যাত্রীদের জন্য হাততুলে মোনাযাত করার পোজ নিয়ে ছবি তোলেন। তা নাহয় তাঁদের ভাড়া করা কিছু লোক তো পোষায় রয়েছে যাঁরা এসব করার জন্য রীতিমত মাইনেও পান। এইভাবে তাঁরা মুসলমানদের মাথায় বেল ভেঙ্গে খান এবং সময়ে অসময়ে এই গণতান্ত্রিক দেশের নেতা বলে থাকেন, “মাদ্রাসা হল সন্ত্রাসবাস তৈরীর আখড়া।” ভোটের সময় এলে বলে, “ওরা ৩৪ বছরে মুসলমানদের জন্য কিছুই করেনি। আমরা করব।” কিন্তু ক্ষমতায় এলে দেখা যায় তারা মুসলমানদের জন্য কিছুই করেন নি। তবুও তাঁরা গলা উঁচু করে বলেন, “৯০ শতাংশ কাজই করে দিয়েছি, তা মানতেই হবে।” মুসলমানরা এসব কিছু বোঝে নাকি?

এ হল গণতান্ত্রিক দেশের তোষনমূলক রাজনীতি। পক্ষান্তরে দেখা যায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলের হিংসাত্মক রাজনীতি। কখনো রামমন্দির নির্মানের ফেনা তুলে উগ্র হিদুত্ববাদকে জাগ্রত করে

ধর্মের নামে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। যেমন, ভাগলপুর দাঙ্গা, কানপুর দাঙ্গা, গুজরাট দাঙ্গা, কোয়েম্বাটুর দাঙ্গা প্রভৃতি দাঙ্গাগুলি ধর্মের নামেই হয়। এবং এগুলো করে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক দলের নেতা নেত্রীরা। রাজনৈতিক বাজারে বাজিমাত করার জন্যই এসব করা হয়। বিভিন্ন সময় মুসলমানদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকী দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাহানুভুতি অর্জন করে গদি দখল করার জন্যই এসব করা হয়। তাতে রাজনৈতিক নেতারা তো লাভবান হন কিন্তু সাধারণ মানুষের সর্বনাশের সীমা থাকে না। এসব একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব হয়।

১৪) গণতান্ত্রিক দেশে হিন্দু অনেক সময় হিন্দু নেতারা মুসলমানদেকে তেলিয়ে এবং মুসলমান নেতারা হিন্দুদেরকে তেলিয়ে ভোট পাবার চেষ্টা করে থাকেন। এতে অনেক সময় নেতারা নিজেদের ধর্মটুকুও পালন করেন না ভোট হারাবার ভয়ে। দেখা যায় পার্টি অফিসে কোন মুসলমান নেতাকে সালাম জানালে ইতস্ততঃ হয়ে যান এবং জবাব না দিয়ে এড়িয়ে চলে যান। পাছে হিন্দুদের কাছে গোঁড়া, মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে না যান। এতে নিজের ধর্মটাকেও পর্যন্ত কবর দেওয়া হয়। এই হল গণতন্ত্রের পরিণাম।

১৫) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় সাহসিকতার সাথে নিজের দলের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ থাকে না। এখানে উপর তলার নেতারা যদি ভূল সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে নিচের তলার নেতাদের কিছুই বলার থাকে না। কিছু বলতে গেলে উপর তলার নেতারা সেই প্রতিবাদী নেতা দল থেকে বহিস্কার করে দেন। যেমন, কয়েক বছর আগে প্রাক্তন বামপন্থী নেতা রেজ্জাক মোল্লাকে সিপিএমএর কর্ণধাররা দলের ভূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়।

১৬) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় সবসময় ক্ষমতাসীন সরকার জোর করে ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে বুথ দখল করে সাজানো ভোট দেয়। অনেক সময় ভোটারদেরকে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে,

সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে ভোট নিয়ে থাকে । যদি কোন লোক তাদের হুমকিতে ভয় না পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেন তাহলে পরবর্তীকালে সেই ব্যাক্তির উপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। অনেক সময় তাদেরকে হত্যাও করা হয়।

১৭) গণতন্ত্র হল এক ধরণের মুনাফেকী শাসনব্যাবস্থা । এখানে জনগনকে খুশি করে ভোট লাভের জন্য সকলকে তোষন করে চলতে হয়। এখানে নাস্তিক, মুর্তাদ, কাফের, ইসলাম বিদ্বেষী সকলকে তোষন করে সঙ্গে রাখতে হয়। ভোট পাবার জন্য সকলের অন্যায় আবদার মেনে চলতে হয় । যেমন, বাংলাদেশের হাসিনা সরকার নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারী নাস্তিকদেরকেও সমর্থন করে এবং মসজিদ মাদ্রাসার পক্ষেও কথা বলে। সুতরাং গণতন্ত্র হল এক চুড়ান্ত মুনাফেকী শাসনব্যাবস্থা।

১৮) গণতন্ত্রে বলা হয়েছে, 'গণতন্ত্র' হল জনগণের শাসন। অর্থাৎ এখানে জনগণ যা চাইবে তাই হবে। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীতটাই হয়। দেশের অধিকাংশ জনগণ যা চাই তা পাইনা। পার্টির নেতারা যা চায় তাই হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছাচারমূলক বল্গাহীন জীবনযাত্রা পছন্দ করে। তারা চায় না তাদের এই বল্গাহীন জীবনযাত্রায় কেউ হস্তক্ষেপ করুক। কিন্তু যখনই জনগণের এই বল্গাহীন জীবনযাত্রায় সরকার পক্ষের বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকারক হয় তখন সরকার তা কঠোরভাবে দমন করে। এখানে আর 'গণতন্ত্র' বজায় থাকে না।

১৯) গণতন্ত্রে বলা হয়েছে জনগণই হল সমস্ত ক্ষমতার উৎস । কিন্তু এই জনগণ যখন সরকারের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তখন সরকার তা কঠিনভাবে দমন করে । এখানেও আর 'গণতন্ত্র' বজায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে বেকার হয়ে পড়ে।

২০) গণতন্ত্রের বলা হয়েছে জনগণই হল সমস্ত ক্ষমতার উৎস। কিন্তু যখন দেশে কোন বিল পাশ করানো হয় বা কোন আইন পাশ করা হয় তখন এতে জনগণের কোন প্রত্যক্ষ হাত থাকে না

এবং অনুমোদনও নেওয়া হয় না। জণগণের উপর আইন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এখানেও আর 'গণতন্ত্র' বজায় থাকে না।

২১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় দেখা যায় যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন তারা নিজেদের সেইসব চিন্তাধারা (Ideology) জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন যা জনগণ চান না। যেমন, ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিজের ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারা জনগণের উপর চাপানোর চেষ্টা করে। যেগুলি থেকে ভারতের জনগণ সাধারণত দূর থাকতে চান। এখানেও আর 'গণতন্ত্র' বজায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে বেকার হয়ে পড়ে।

২২) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় দেখা যায় কোন সরকার যখন বিপুল ভোটে জয়ী হয় তখন সেই সরকার অনেকটা স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। বিরোধী দলগুলি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার ফলে অনেকটা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে ক্ষমতাসীন সরকার ইচ্ছামত পদক্ষেপ নিলে প্রতিবাদ করার মতো কেউ থাকে না। এক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলি সরকারপক্ষের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করলে কিছুটা লাভবান হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যার্থ হয়।

২৩) গণতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস বলা হলেও সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে পার্টির নেতারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ মানুষ কোন সমস্যায় পড়লে প্রশাসনের কাছে না গিয়ে পার্টির নেতার হাত ধরে। ঘরোয়া সমস্যা থেকে শুরু করে বড় বড় যে কোন ধরণের সমস্যার সমাধান পার্টির নেতার কাছে বা মন্ত্রীদের কাছে করা হয়। আর প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিয়ে পার্টির এইসব নেতা-মন্ত্রীরা একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করেন।

২৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যতটা মানবতার লঙ্ঘন হয় ততটা অন্য কোন রাষ্ট্রে হয় না। এমনকি রাজতন্ত্রেও এত মানবতার লঙ্ঘন হয় নয়। আমেরিকার মত প্রথম শ্রেণীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ২৪ ঘন্টায় যে মানবতার লঙ্ঘন করে এই তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রেমীরা তা সৌদী আরবের মত স্বৈরাচার

বাদশাহরা সারা বছরেও করে না। এবং আমেরিকায় ২৪ ঘন্টায় যে অপরাধ হয় তা সৌদী আরবের মত রাজতন্ত্র দেশে সারা বছরেও হয় না।

২৫) গণতান্ত্রিক দেশের নেতা-নেত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেতেই বুর্জোয়া শ্রেণীর কেনা গোলামে পরিণত হন।

২৬) গণতন্ত্রে মানুষের যোগ্যতার তুলনায় চাটুকারিতার মূল্য বেশী, ফলে যে যত বেশী মিথ্যা বলে মানুষকে ধোকা দিতে পারে সেই নির্বাচিত হয়।

২৭) এখানে যোগ্যতা বিবেচনার কোন বালাই থাকেনা। জনগনকে ভোটের আগে ঘুষ খাওয়ানো হয়। সবচেয়ে বেশী ঘুষ আদান প্রদান হয় খোদ মার্কিন মুল্লুকে।

২৮) এই ব্যবস্থায় ৫১% ভোটের উপর ভিত্তি করে বাকি ৪৯% মানুষের মতামত কে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়। মোটামুটি গণতন্ত্র না সার্বজনীন ব্যবস্থা, না এটা রুচিশীল সৎ নেতৃত্বের স্বাধিনতা নিশ্চিত করে।

২৯) এখানে তথাকথিত অর্থনৈতিক মুক্তির নামে ঋনপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব সাধারন মানুষের রক্ত চুষে খায়। গরিব আরো গরিব হয়, ধনী আরো ধনী হয়। উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার নামে স্থানীয় সাধারন উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্যের অবমুল্যায়ন করা হয়। যেখানে কতিপয় মাল্টি-ন্যাশনাল পুরো বাজার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়।

৩০) বিচার ব্যবস্থার বালাই থাকে না; ক্ষমতাসীনরা তাদের ইচ্ছামত বিচারকের কলকাঠি নাড়ে। যেখানে একজন প্রমানিত খুনের সাজা -প্রাপ্ত আসামীও ক্ষমা পাওয়ার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর বাইরে স্থানীয় পর্যায়ে যে দল যখন ক্ষমতায়, তার নেতাকর্মীর জন্য সাত-খুন মাফ।

৩১) সমাজে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ গনতান্ত্রিক সমাজের একটা অংশ হয়ে দাড়িয়েছে। সুতরাং যতসামান্য আলোচনা থাকে প্রতীয়মান হয় যে গনতন্ত্র কোন কল্যান কর ব্যবস্থা তো নয়ই বরং এটা আবেগ তাড়িত বিষয় ও ক্ষণ ভঙ্গুর শাসন ব্যবস্থা যেখানে অবৈধ অর্থ এবং পেশি শক্তির মহড়া একটা প্রধান ভিত্তি। কোন সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানসিকতার মানুষের পক্ষে গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশগ্রহন করে সমাজের কল্যান সাধন সম্ভব নয়।

৩২) বলা হয় যে গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যাঁকে শাসক নির্বাচন করবে তিনিই হবেন রাষ্ট্রনেতা। অথচ বাস্তবে তা হয় না। উদাহরণস্বরুপ, মনে করে ভারতের লোকসভা নির্বাচনে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এখানে 'A' হল একটি রাজনৈতিক দল, 'B' হল একটি রাজনৈতিক দল, 'C' হল একটি রাজনৈতিক দল, 'D' হল একটি রাজনৈতিক দল, 'E' হল একটি রাজনৈতিক দল, 'F' হল একটি রাজনৈতিক দল, এবং 'G' হল একটি রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে 'A' পেয়েছে ২০% ভোট, 'B' পেয়েছে ৩০% ভোট, 'C' পেয়েছে ১০% ভোট, 'D' পেয়েছে ১০% ভোট, 'E' পেয়েছে ১০% ভোট, 'F' পেয়েছে ১০% ভোট, এবং 'G' পেয়েছে ১০% ভোট।

এখানে 'A' এর থেকে 'B' বেশী ভোট পেয়েছে কিন্তু বাকি (C, D, E, F, G) দলগুলি যখন জোট করে 'A' কে সমর্থন করে দেয় তখন 'B' 'A' এর থেকে বেশী ভোট পেয়েও পিছিয়ে পড়ে এবং 'A' রাষ্ট্রপ্রধান হয়। কিন্তু C, D, E, F, G প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলিকে যারা ভোট

দিয়েছিল তারা অনেকেই চাইনি 'A' রাষ্ট্রপ্রধান হোক কিন্তু জোট সমর্থনের জন্য শেষ পর্যন্ত 'A' রাষ্ট্রপ্রধান হয়। এ হল গণতন্ত্রের চরম ব্যার্থতা।

সুতরাং খেলাফত-ই একমাত্র সমাধান। সেজন্যই আল্লাহ খেলাফত প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামুলক এবং যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলী নির্ধারন করে দিয়েছেন। শর্তসমুহ হচ্ছেঃ

(১) আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও সৎকর্মশীল হওয়া,

(২) শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং

(৩) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা।

আল্লাহ্ বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন । যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে (ইসলাম), যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় -ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। [সূরা নূর ; ২৪ : ৫৫] দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য -বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। (সূরা -বাকারা : ২: ২৫৬) কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাগুত কি ? তাগুত হচ্ছে মানুষের তৈরী জীবন- ব্যবস্থা।যা উপরে এতক্ষন ধরে আলোচনা করলাম। যেমন -গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি। একে জেনে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করতে হবে। আর সেজন্য আল্লাহ কিয়ামতের দিন হ আমল নামা হাতে দিয়ে বলবেন, পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (সুরাঃ বনী ইসরাইল ১৭: ১৪)

আল্লাহ সবচাইতে বেশি খুশি হয় যখন বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ'র দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করে। আল্লাহ বলেন, তারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা মায়েদাহ ৫ : ৭৪) আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (সুরা তাহা : ৮২)

রাসুল (সঃ) বলেন, "প্রতিটি মানুষই ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাকারী।" [তিরমিযী, ২৪২৩]

আশা করি আমি পাপী - গুনাহগার , আমার পাপ মাফ করার মত নয় এমন আশঙ্কা আমরা করব না। আমরা মনেপ্রাণে শত ভাগ বিশ্বাস রাখি সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বান্দার উপর আল্লাহ সবসময় দয়াবান। তবে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন না যারা বুঝে - শুনে শয়তানের মত গুনাহের উপর সবসময় স্থির থাকেন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেন, আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সুরা নিসাঃ ৪ : ১৮)

এছাড়াও আল্লাহ বলছেন; যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (সুরা মায়েদা, আয়াত ৫ : ৪৪, ৪৫, ৪৭)

সুতরাং গণতন্ত্র দ্বারা কোনদিনই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একমাত্র খেলাফতই আনতে পারে সমাজে শান্তির বাতাবরণ।

গণতন্ত্র সম্পর্কে মনীষীদের বক্তব্য

১) প্লেটোঃ

"সংখ্যাধিক্যের শাসন প্রকারান্তরে মুর্খেরই শাসন।"

২) জন ড্রাইডেন **[John Dryden (1631 - 1700)]**

"Nor is the Peoples Judgment always true: The Most may err as grossly as the Few. *(Absalom and Achitophel)*

অর্থাৎ "জনগণের বিচার সবসময় সঠিক হতে পারে না। কম লোক যেমন ভূল করতে পারে তেমনি বেশিরভাগ লোকও ভূল করতে পারে।

৩) উইন্টন চার্চিলঃ

"পৃথিবীতে গণতন্ত্রই সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। তবে এ যাবৎকাল আমরা যেসব পদ্ধতি চেষ্টা করেছি তার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম। (Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time)

তিনি আরও বলেন, "গণতন্ত্র হলো গড়পড়তা জনগণের সাথে ৫ মিনিটের আলোচনা।" (Democracy is a five minute discussion with the average voter)

(তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো-আলপিন, ১২/২/২০০৭)

৪) চিদাম্বরমঃ

"গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত নেওয়াটাকে অনেকসময় পঙ্গু করে দেয়, গণতন্ত্রের এই নীতি পরবর্তন করতে হবে। (১৮ জুলাই ২০০৮)

৫) বার্ট্রান্ড রাসেলঃ

"হিংসায় গণতন্ত্রের ভিত্তি।" ("Envy is the Basis of Democracy")

৬) জন লেকিঃ

"গণতন্ত্র দরিদ্র প্রপীড়িতম অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন। কারণ রাষ্ট্রে এদের সংখ্যায় অধিক। …প্রজ্ঞা, জ্ঞান কিছু সংখ্যক লোকের অধিকারভূক্ত। প্রশাসনিক কাজে সফলতা অর্জনের জন্য তাদের হাতে ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।"

৭) রুশো **(1712 - 1778)**

In the strict sense of the term, there has never been a true democracy, and there never will be. It is contrary to the natural order that the greater number should govern and the smaller number be governed. *(The Social Contract)*

অর্থাৎ "সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বলতে হয়, কোথাও প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং কখনও পাওয়া যাবে না। কারণ এটা প্রাকৃতিক রীতিবিরুদ্ধ যে, সংখ্যাগরিষ্ঠকে অপরিহার্যভাবে শাসন করতে হবে আর সংখ্যালঘুকে শাসিত হতে হবে।"

৮) এডমান্ড বার্ক [Edmund Burke (1729 - 1797)]

"Man is by his constitution a religious animal. A perfect democracy is therefore the most shameless thing in the world." *(Reflections on the Revolution in France)*

অর্থাৎ "মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই ধার্মিক রক্ষনশীল জীব। প্রকৃত গণতন্ত্র তাই পৃথিবীর সর্বাধিক নির্লজ্জ জিনিস।"

৯) মাইকেল গোরবাচেভ [Mikhail Gorbachev (1931 -)]

"Some comrades apparently find it hard to understand that democracy is just a slogan. The Observer (London), (*Sayings of the Week)*

অর্থাৎ "কিছু কমরেড তাৎক্ষনিকভাবে এটা বুঝতে কষ্ট অনুভব করে যে, গণতন্ত্র কেবলই একটি শ্লোগান বা প্রচারণা।"

১০) হেনরী বুরাশা [Henri Bourassa (1868 - 1952)]

Canadian politician and journalist - There is no greater farce than to talk of democracy. To begin with, it is a lie; it has never existed in any great country. *(Le Devoir)*

অর্থাৎ "গণতন্ত্রের কথা বলার চেয়ে বড় প্রতারণা আর নেই। তার শুরুটাই একটি মিথ্যা। কোন বৃহৎ বা সমৃদ্ধ (মহৎ) রাষ্ট্রে এটা কখনো স্থায়িত্ব লাভ করে নি।"

১১) ফাতিমা মারনিসি (মরক্কান লেখক) [Fatima Mernissi (1941 -)]

"Western democracy, although it seems to carry within it the seeds of life, is too linked in our history with the seeds of death." (*Islam and Democracy)*

অর্থাৎ “পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, যদিও মনে হয় এর অভন্তরে জীবনের বীজ বহন করে, তবে আমাদের ইতিহাসে এটা মৃত্যুর বীজই বহন করে এনেছে।”

১২) আর ডব্লু বাকের **(R.W. Baker)**

“The democracy is foundamentally different and contrary to Islam because of having its root in western liberalism.” *(Islam without feer, R.W. Baker, USA, 2005)*

অর্থাৎ “গণতন্ত্র ভিত্তগতভাবে ইসলামের সাথে পৃথক ও বৈপরীত্যপূর্ণ আদর্শ। কেননা এটা পশ্চিমা উদারতাবাদের মাঝে মূলীভূত।

এছাড়াও দার্শনিক প্লেটোর সময়কাল থেকে হেনরী মেইন, লেকি, টেরিল্যান্ড, এমিল ফাগুয়ে এরুপ বহু অমুসলিম দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবি গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

গণতন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের বক্তব্য

১) আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীঃ

আরব জাহানের সালাফীদের মহামান্য আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন,

فالديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان، إما الإيمان بالله والحكم بما أنزل الله، وإما الإيمان بالطاغوت والحكم به وكل ما خالف شرع الله فهو طاغوت ....ومن يقل إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمن ثم فلا مانع من الانتخابات يقال له ليس صحيحا أنه لم يثبت ذلك في الشرع، فما فعله الصحابة من كيفيات الاختيار للحاكم فكلها طرق شرعية، وأم طريقة الأحزاب السياسية فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع لها ضوابط وتؤدي إلى تولية غير المسلم وليس أحد من الفقهاءيقول بذلك–(مجلة الأصالة، العدد ٢ ص :٢٤ وعنه حكم الإسلام في الديمقراطية ص٢٧ :٢٩)

অর্থাৎ "ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটো বিপরীতমুখী ব্যবস্থা। এটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি ত্বাগুতের (আল্লাহ নির্দেশিত পন্থার বিরোধী ব্যবস্থা) প্রতি আস্থা জ্ঞাপন ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর ভিত্তিশীল। ......যদিও কেউ বলে যে, শাসক নির্বাচনের জন্য শরীয়াতে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই অতএব নির্বাচনে অংশগ্রহণ দোষনীয় নয় তবে তার উত্তরে বলা যায় যে, শরীয়াতে এটা সাব্যস্ত হয় নি – এ কথা সঠিক নয়। কেননা সাহাবীরা নেতৃত্ব নির্বাচনের যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সেসবই শরয়ী' পদ্ধতি। এছাড়াও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর পদ্ধতি বেঠিক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাদের এ বিষয়ে নির্ধারিত নীতিমালা নেই। ফলে তা একজন অমুসলিমকে নির্বাচিত করাকেও সমর্থন দেয়। কোন বিদ্বান এ ধরণের কথা বলেন নি।" (মাজাল্লাতুল আসালাহ (পত্রিকা), সংখ্যা-২, পৃষ্ঠা-২৪), হুকমুল ইসলাম ফিদ দেমোক্রেসিয়া, পৃষ্ঠা-২৭-২৯)

২) আবু কাতাদা উমার বিন মাহমুদঃ

“জেনে রাখা উচিত যে, যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেকাতে চায় তাদের প্রচেষ্টা যিন্দিকের (বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমান অন্তরে ইসলামের শত্রু) মত যারা মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলে । যদিও ইসলামে গণতন্ত্রের মত শাসক নির্বাচনে জনগণের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তবে পার্থক্য হলো – ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয় । অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে । এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব। *(আল জিহাদ ওয়াল ইজতেহাদ, পৃষ্ঠা- ১০৩-১০৪)*

৩) মুহাম্মাদ কুতুবঃ

“লিবারেল গণতন্ত্রে কি মানুষের জীবন পরিচালনায় এক আল্লাহকে মা’বুদ হিসাবে স্বীকার করা হয় নাকি বহু ইলাহের আনুগত্য করা হয়? প্রত্যেকেই বলতে বাধ্য হবেন সেখানে একক প্রভূ হিসাবে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়না । ……আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিধান হল দুটি- একটি হল আল্লাহর বিধান অপরটি হল জাহিলিয়াতের বিধান । (সুরা মায়েদা, আয়াত ৫০) গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয় সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান । আমরা অনেক মানুষকে জানি যারা গণতন্ত্রকে জাহেলি বিধান ভাবতে বিস্ময়বোধ করেন, জোর গলায় তার প্রতিবাদও করেন, শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাই নন বরং অনেক ইসলামপন্থীও ।” *(ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫)*

৪) আল্লামা শানক্বীতীঃ

আল্লামা শানক্বীতী গণতন্ত্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, “নিশ্চয় যারা অনুসরন করে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের বিরোধীতায় প্রণীত মানবরচিত বিধিবিধানকে যা শয়তান তার

অনুসারীদের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছে সে নিঃসন্দেহে কাফির ও মুশরিক।" (আযওয়াউল বায়ান, পৃষ্ঠা-৭/১০৫-১০৭, ৪/৬৬)

৫) শায়খ আদনান আলী আন নাহভীঃ

"গণতন্ত্র সমাজের মুখ থেকে, অন্তর থেকে, চেতনা থেকে ইসলামের শক্তিকে সমূলে বিদুরিত করার একটি অস্ত্র। গণতন্ত্র তার ধ্বংসকারী মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ হিসাবে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণে, জনগণের নীতি সুরক্ষায় সমাজে আরোপ করেছে। আর সেসব মূলনীতিকে বিধিবদ্ধ আইন, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচিতির মাঝে কাঠামোবদ্ধ করেছে।…… আর সময়ের ব্যাবধানে এই নীতিগুলো বহুজনের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটিয়ে চলেছে। ফলে যত্রতত্র এর গুনগানে কিছু মুসলমান মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার 'দ্বীন থেকে রাষ্ট্রকে পৃথকীকরণ' নীতি পরিস্কারভাবে কুফরী।" (আশ-শুরা লা আদ-দিমুকরাতিয়াহ, পৃষ্ঠা-৪৯-৫২)

৬) আবু মুহাম্মাদ আছেম আল মাকদাসীঃ

"এটি (গণতন্ত্র) মোটেই ইজতেহাদী বিষয় নয় যেমনটি কিছু মিষ্টিমুখ ব্যাক্তি বলতে চান, বরং এটি পরিস্কারভাবে শিরক ও কুফরী।" (আদ-দিমুকরিয়াতু দ্বীনুন, পৃষ্ঠা-২)

৭) সাইয়িদ কুতুব শহীদঃ

حاكمية العباد للعباد

অর্থাৎ (গণতন্ত্র হোক, সমাজতন্ত্র হোক, একনায়কতন্ত্র হোক সবগুলোই যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো) মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব।" (ফি যিলালিল কুরআন, ৩/১৮৭, সুরা আরাফ, আয়াত ১০)

৮) উর্দূ কবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ)

"গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈরাচার দৈত্যের মতো তান্ডবনৃত্য চালাচ্ছে। অথচ তাকেই মনে করা হয় স্বাধীনতার নীলপরী। গণনন্ত্রের একমাত্র কাজ হল ধনীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য গরীবকে শোষন করা। সেকুলার গণন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা কখনোই উত্তম হতে পারে না।"

তিনি আরও বলেন, "গণতন্ত্র রাজনৈতিক বিভক্তির জন্য একটি নগ্ন তরবারি। এটি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ। এটি মানুষের মাথা গননা করে। কিন্তু তার মেধাকে যাঁচাই করে না। দুই হাজার গাধার মেধা একজন মানুষের মেধা তৈরী করতে পারে না।"

৯) সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীঃ

"......ধর্মহীনতা বা ধর্ম্মনিরপেক্ষতা উহাদেরকে আল্লাহ তাআলার ভয়ভীতি এবং চরিত্রের দৃঢ় নীতিমালার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে লাগামহীন ও প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত করে দিয়েছে। অতপর জাতিয়তাবাদ এসে উহাকে কঠোর রুপে জাতীয় আত্মস্বার্থপর অন্ধ গোড়ামী এবং জাতীয় গৌ্রব অহংকারের নেশায় মাতাল করে তুলেছে। আর এখন গণতন্ত্র এসে উহার সাথে জুড়ি হয়ে এসব লাগামহীম মাতাল ও প্রবৃত্তির গোলামদের ইচ্ছা আকাংখাকে আইন প্রণয়নের পূণ স্বাধীনতা দান করেছে।" (ইসলাম ও ধর্মহীন গণতন্ত্র, পৃষ্ঠা-১৮)

১০) মাওলানা আব্দুর রহীমঃ

"মৌলিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের মূলেই রয়েছে। মানবীয় স্বার্বভৌমত্ব। আর মানবীয় স্বার্বভৌমত্ব কখনো ব্যাক্তিভিত্তিক কখনো চলে সমষ্টিভিত্তিক।" (প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য, পৃষ্ঠা-১১)

তিনি আরও লিখেছে, "প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামের শূরা-ই-নিযাম পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একটি অপরটির সাথে কোন দিক দিয়েও একবিন্দু মিল, সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য রাখে না। ...... আসলে গণতন্ত্র একটি মতবাদ – একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। যার দুটো দিক আছে। একটি

হচ্ছে তাত্ত্বিক অন্যটি বাস্তব। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে গণতন্ত্র বলতে যে জিনিসটাকে বোঝায় সেটাকে 'কুফর' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।······ গণতন্ত্র আর ইসলাম দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ। বিপরীত দর্শন, বিপরীত ভাবধারা ও বিপরীত ব্যবস্থাসম্পন্ন জীবন দর্শন। কোথাও এদুয়ের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।" (গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা ও শূরা-ই-নিযাম, পৃষ্ঠা-৩,৪)

তিনি আরও বলেছেন, "গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।" (গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা ও শূরা-ই-নিযাম, পৃষ্ঠা-১৪)

১১) আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশীঃ

"(পাকিস্তানের প্রস্তাবিত 'ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র' সম্পর্কে) বর্তমান সময়ে ওয়াইন এন্ড ফুডের হোটেল, রেস্তোরা, বিড়ি, সূদী লেনদেনের প্রতিষ্ঠান ········· থেকে শুরু করে ন্যাশনালিজম ও সোশিলিজম পর্যন্ত 'ইসলামী' সাইনবোর্ড ও লেবেল সুভোশিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং ইসলামী ও কুফরী ব্যাভিচার, ইসলাম ও কুফরী ন্যাশনালিজম ও সোশিয়ালিজমের মধ্যে প্রভেদ করা যেরকম অসম্ভব, সেইরুপ ইসলামী ও কুফরী গণতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা সুগঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরুপ উপলব্ধি করা কাহারো সাধ্যয়াত্ম নয়।" (প্রবন্ধ-গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও আকৃতি, তর্জুমানুল হাদীস ১/২ সংখ্যা, ১৯৪৯ ইং, পৃষ্ঠা-৮৫)

তিনি আরও লিখেছেন, "ইসলামের মধ্য গণতান্ত্রিক যদি কোন ইঙ্গিত থাকে তজ্জন্য "গণতান্ত্রিক ইসলাম' নামে কোন বস্তু পরিকল্পিত হতে পারে না।" (ঐ,পৃষ্ঠা-৮৬)

১২) আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস **(**জ্যামাইকা**)**

"গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের আচরিত মানবতাবাদী আদর্শ যার মূলে রয়েছে ডারউইনের থিওরী। এ থিওরী অনুযায়ী যোগ্যতমেরই কেবল বেঁচে থাকার অধীকার রয়েছে এবং তাঁদের কর্তৃত্বই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে শক্তিবলে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যবিশ্ব। আর সামন্তবাদী ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের দুঃসহ অভিজ্ঞতা বহন করার পর আজ

গণতন্ত্রই তাদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য আদর্শে (যদিও এটি প্রাচীন গ্রীক কর্তৃক প্রবর্তিক) পরিণত হয়েছে। যেহেতু আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র তাদের নিকট স্বীকৃত অন্যদিকে তারা নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে যোগ্যতম মনে করে তাই তারা ডারউইনী থিওরী অনুযায়ী এ আদর্শে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা চায়। পৃথিবীর সকল দেশে তারা ইতিবাচক সাড়া পেলেও কেবল মুসলিম দেশগুলোতে এ আদর্শের পূর্ণ প্রবর্তন করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলো নিয়ে এটাই তাদের মাথাব্যাথার মূল কারণ।

মূলতঃ গণতন্ত্র কেকের উপরস্থিত ক্রিম। মূল অংশ তথা কেকটি হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ কারণেই দেখা যায় কোন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সামরিক বা স্বৈরাচারী সরকার থাকলেও যদি সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নীতি প্রতিফলিত হয় তবে পাশ্চাত্যে সে সরকারকে খারাপ চোখে দেখা হয় না। তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম মানুষের কিছু অবাস্তব অতীন্দ্রীয় কল্পনার সমষ্টি। অতএব আচার বিভিন্ন হলেও সকল ধর্ম মূলতঃ এগুলো একই গোড়া তথা মানবীয় কল্পণা থেকে উৎসারিত। মৌলিকভাবে সবগুলোই মানুষের তৈরী বিশ্বাস বা কুসংস্কার, অন্যদিকে যেগুলোকে বলা যায় লোকজ বা অন্তজ সংস্কৃতি। তাই পাশ্চাত্য যে যা বিশ্বাস করুক না কেন তাকে সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে ‘ধর্মপালনের স্বাধীনতা’র নামে তাদের পরিতুষ্ট করে। আর এতে অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এসব ‘কুসংস্কারে’র অনুপ্রবেশ করেছে না বলে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষনের ফলেই তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠলে একে অযৌক্তিক মনে করে, কেনমা সকল ধর্মবিশ্বাস একই উৎসে মূলীভূত। কোন যুক্তিতে একটা অপরটার উপর প্রাধান্য পাবে? এটি কাম্য, উদারতা, সহিষ্ণুতার নীতি বহির্ভূত। এভাবেই ধর্মনিপেক্ষতাবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোষক রাষ্ঠনীতি গণতন্ত্র আধুনিক তথা পাশচাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে যাকে আধুনিক দুনিয়ার জন্য একমাত্র সমাধান এবং ‘সুপিরিয়র মরালিটি’ মনে করা হয়। আর এজন্যই ডারউইনী থিওরী অনুসরণে সারা বিশ্ব তার প্রতিষ্ঠা দেওয়াকে তারা অপরিহার্য মনে করছে।

আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, কোন সিস্টেম তা যদি ধর্মনিপেক্ষতানির্দেশক হয় তবে তা সরাসরি ইসলাম বিরোধী এখানে মধ্যবর্তী কিছুর অস্তিত্ব নেই । একজন মুসলমানের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ কোন ক্ষেত্র নেই । কেননা ইবাদতের অর্থই হলো যা কিছু করা হবে তা শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই। অন্য ধর্মগুলি মানবতার ধর্ম (Man-made) বলে পরিচিত। সুতরাং গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের যে সূচক তা হলো-গণতন্ত্রে (Human System) সুনির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ কোন ব্যাবস্থা স্বীকৃত নয়; হোক তা কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা সাধারণ নীতি; বরং আইন সবসময়ই সেখানে পরিবর্তনযোগ্য ‘consenting adult’তথা প্রাপ্তবয়স্কের ইচ্ছাই গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। অন্যদিকে ইসলামে (Devine System) ধর্মই মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালনা করে এবং ধর্মকে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করা হয় । সুতরাং এ দুটোর মধ্যে কোন কমপ্রোমাইজিং প্রিন্সিপল অবলম্বনের অবকাশ নেই।

ইদানিং ‘মডারেট’ ইসলামপন্থীরা ইসলামী গণতন্ত্র কথাটি উল্লেখ করছেন । মূলতঃ এটা অসম্ভব। কেননা গণতন্ত্রের অর্থ হল জনগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবকিছু চলবে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের। আর ইসলামে এ ক্ষেত্রে মূল ক্ষমতাধর হলেন আল্লাহ এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের নিকট পথ প্রদর্শক হলেন রাসুল (সাঃ) । আর পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামের নীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। কারণ এটি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এটি নির্ভরশীল নয় । সৃষ্টির ইচ্ছার পরিবর্তনে স্রষ্টার ইচ্ছা পরিবর্তনযোগ্য নয় । এজন্য ইসলাম ধর্ম পাশ্চাত্যের নিকট ‘মৌলবাদী’, মানবতার স্বাধীনতা ক্ষুন্নকারী ধর্ম হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে । অবশ্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীরা ধর্মের প্রত্যক্ষ গুরুত্ব স্বীকার না করলেও তাদের আইনের মূলনীতিগুলো তাওরাতের ‘দশ নির্দেশ’ থেকে গ্রহণ করেছে। আবার ব্যাভিচারকে তারা সিদ্ধ করেছে, যদিও সেটা বাইবেল নীতি বিরোধী । বাইবেলের নিশেধাজ্ঞা সত্বেও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, নীতি হিসাবে বাইবেলের পরোক্ষ কিছু ভূমিকা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে তার কোন গণতান্ত্রিক গুরুত্ব নেই । কেননা গণতন্ত্রে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রবর্তিত বা গৃহীত নীতিই মূলতঃ ধর্ম।” *(Mankind in crisis, VCD)*

১৩) আব্দুর রহীম গ্রীন **(**১৯৬৪**)-**ইংল্যান্ডঃ

“যে আইন ও বিধান মানবের সার্বভৌমত্বে রচিত তার সাথে কিভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে প্রবর্তিত আইন ও বিধানের সাথে তুলনা করা যায়? ……সুতরাং আমি কষ্ট অনুভব করি যখন কোন মুসলমান বলেন যে, ইসলামে গণতন্ত্র রয়েছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে ইসলামে কুফর রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রচলিত গণতন্ত্র আজ ব্যার্থ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এটা কিছু মানুষকে বোকা বানানোর নীতি। আমার বিশ্বাস এ নীতি আর অতি অল্পদিনই টিকে থাকবে। বর্তমানে গণতন্ত্রের নামে পাশ্চাত্যে যা চলছে তা বলা ‘এলুঝন’। কারণ এর দ্বারা মানুষকে বিশ্বাস করানো হচ্ছে তারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। অথচ সুক্ষ দৃষ্টিতে এটা অনুভব করা যায় তা হলো বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীদের কাছেই রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে। কোন অবস্থাতেই সেখানে তাদের স্বার্থ অগ্রাহ্য করে কোন কাজ করা হয় না।” *(Democracy & Islam. Public Lecture in `Peace Tv')*

১৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)

“নেতা নির্বাচন স্বেচ্ছাচারমূলক হবে যায় না বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ লোকের পরামর্শের ভিত্তিতে হবে হবে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাদের পরামর্শের যোগ্য হতে হবে। কোনক্রমেই পরামর্শের অযোগ্য লোকের পরামর্শ নেওয়া হবে না। পরামর্শের পর আমীর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাই অগ্রগন্য হবে।” (তাফসীরে মা’রেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা-২১২, ১৩)

গণতন্ত্রের অভিশাপ

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র সফল গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলতে বোঝায় আমেরিকা ও বৃটেনকে। গণতন্ত্রের নামে কি করছে তারা। গোয়েন্দা তথ্য জাল করছে, ইরাকের মতো দেশ আক্রমন ও দখল করছে, হত্যা করছে হাজার হাজার নিরীহ নরনারী। উদ্দেশ্য একটাই, সে দেশে নিজেদের

অধিকার কায়েম করা। ইজরায়েল যখন-তখন ফিলিস্তিনীদের হত্যা করছে-তাদের অপরাধ, তারা তাদের স্বদেশে বসবাস করতে চাইছে। অথচ গণতন্ত্রের দুই ধ্বজাধারী ব্রিটেন ও আমেরিকা সেই ইজরায়েলকেই মদত দিচ্ছে। সৌদী আরবের রাজা এবং কুয়েতের আমীর – এই দুই স্বৈরাচারী তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই হল গণতন্ত্রের নমূনা। তাহলে মুসলমানদের কাছে গণতন্ত্র প্রিয় হবে কেন? পাশ্চাত্যের নেতারা চান অন্যান্য দেশে গণতন্ত্র কায়েম হোক এবং তাদের পছন্দমত স্বৈরাচারী শাসক নির্বাচিত হোক যারা তাদের হুকুম মেনে চলবে।

সবথেকে বড় বিপদ লুকিয়ে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্র নির্ভর শাসনব্যবস্থা। ফলস্বরুপঃ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু জঙ্গি বাবরী মসজিদ ধ্বংস করল। তারই প্রতিক্রিয়ার ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যায়, তার প্রভাব পড়ে গিয়ে প্রতিবেশী দেশেও। পরিণতি, বহু নিরীহ মানুষের জীবনহানি। এফআইআর এ নাম ছিল কয়েকজন হিন্দু জঙ্গির। তাদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে এমপি হন, মাননীয় মন্ত্রী হন এবং লাল কৃষ্ণ আদবানীর মত ব্যাক্তি ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী হয়। এই হল গণতন্ত্রের অভিশাপ।

এরপর গুজরাটের মাটিতে শোচনীয় ঘটনা ঘটে। কয়েকমাস ধরে চলে গুজরাটে ভয়বঙ্কর হত্যালীলা। শুরু হয় ২৭-২-২০০২। এই গুজরাট দাঙ্গায় সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু জঙ্গিরা, বহু পুলিশ অফিসার, আমলা এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের যোগসাজেসে শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করল, নষ্ট করল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। সাংবাদিক তিস্তা শীতলাবাদের ভাষায়, “আমি একে ‘দাঙ্গা’ বলব না, মনে হয় সংবাদ মাধ্যম ভূল বলছে। এখানে আমি যা দেখেছি, তা হল রাষ্ট্র পরিচালিত একটি জনগোষ্ঠীর সমূল উচ্ছেদ এবং গণহত্যা। মনে হয় না এ ভাবে বললে সেটা কোন চমক সৃষ্টি করা হচ্ছে। হত্যালীলায় গণহত্যার সমস্ত উপাদান মজুদ ছিল-বর্বর হত্যাকান্ড। সরকারি হিসাবে জীবনহানি ৭০০-র সামান্য কিছু বেশি। আমি যে পরিসংখ্যান পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা হতবুদ্ধিকর – ২,০০০। অর্থনীতির ক্ষতি বিপুল। অন্তত ৪,৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হেছে বলে আমাকে জানানো হয়েছে। আর, তার মধ্যে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ সম্পত্তির মালিক

ছিলেন মুসলমান। কেবল আহমেদাবাদেই ২৬টি দরগা এবং মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। সমগ্র গুজরাটে এই সংখ্যা ২৫০ থেকে ৩০০-র মধ্যে হবে। ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিপরিচয় মুছে ফেলার নির্ভেজাল এক প্রচেষ্টা।" *(সোদিকুজ্জামান এবং সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শরবিদ্ধ স্বদেশ, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-২৪-গ্রন্থে উদ্ধৃত তিস্তা শীতলাবাদের উক্তি, তথ্যসূত্রঃ ইসলাম ৯/১১ ও বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদ, পৃষ্ঠা-১৪৮-১৪৯, ড নজরুল ইসলাম, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, বঙ্গানুবাদ-অজয় গুপ্ত)*

এবার দেখুন গণতন্ত্র কতখানি ভয়ঙ্কর রুপ ধারণ করেছে। ক্ষমতাসীন সরকার যখন দেখল, এই বীভৎস গণহত্যার মধ্য দিয়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাস খেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে প্রশ্নাতীত আনুগত্য সে অর্জন করতে পেরেছে, সে সময়ের আগেই বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের সুপারিশ করল। এবং জনসাধারণ ভোট দিয়ে এই সাম্প্রদায়িক দলকেই আবার ক্ষমতায় বসালো। প্রশাসনে আবার এসে বসলেন সেইসব পুলিশকর্তা এবং আমলা, যাঁদের দাঙ্গায় কালো হাত তখনো শুকোয়নি। অভিযুক্ত মুসলমানদের শাস্তি হল। আর হিন্দু অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। দাঙ্গায় পীড়িত মুসলমানরা সামান্যতমও বিচার পেলেন না। কিন্তু ১২-৪-২০০৪ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, গুজরাট সরকারের নেতাদের এ কালের 'নীরো' বলে বর্ণনা করলেন এবং বেস্ট বেকারি মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়া সকলের পূর্বাদেশ বাতিল করে, মহারাষ্ট্রে পুনর্বিচারের আদেশ দিলেন। এই হল গণতন্ত্রের অভিশাপ। গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করেই গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী মানবতার উপর চরম হামলা করে। আর সেই গণতন্ত্রকে প্রয়োগ করেই সে গুজরাটে ক্ষমতাসীন হয়।

'২০০২ সালের মার্চ মাসে ভদোদরায় বেস্ট বেকারির কাছে ১৪ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল যারা, সেই খুনিদের সঙ্গে ঘবিষ্ঠ মোদী সরকারকে কার্যত অভিযুক্ত করে কোর্ট বলে; যখন নিষ্পাপ শিশু এবং অসহায় নারীরা পুড়ছে, তখন এ কালের নীরো-রা অন্যদিকে তাকিয়েছিল, বোধ

হয় চিন্তাভাবনা করছিল, যারা এই অপরাধ করছে কী করে তাদের রক্ষা করা যায়।' (The Hindustan Times, Kolkata, 13.4.2004 Page-1, Col-7)

এরকম মানবতার লঙ্ঘন কেবলমাত্র আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। যেখানে নরেন্দ্র মোদীর মত হাজার হাজার মুসলমানের হত্যাকারী, মানবতার চরম শত্রুরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেশের রাষ্ট্রনেতা নির্বাচিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা, আমেরিকার জর্জ বুশ, বারাক ওবামা, বিল ক্লিন্টন, টোনি ব্লেয়ার প্রভৃতিরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই রাষ্ট্রনেতা নির্বাচিত হয়েছেন এবং দিনের পর দিন মানবাধিকার লঙ্ঘন করে হাজার হাজার মানুষের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করেছেন। এরকম দিনের পর দিন মানবাধিকার লঙ্ঘন সৌদি আরবের মত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং পাকিস্তানের সামরিক জুন্টার শাসনে এটা কখনোই সম্ভব নয়। ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আছে বলেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বিজেপির নেতা এমপিরা দিনের পর দিন ভারত থেকে তেড়ে দেবার, ভারতকে মুসলমান মুক্ত করার হুমকি দিচ্ছে।

গণতন্ত্রের ধবজাধারী আমেরিকা

সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবথেকে বেশি তৎপর হোল আমেরিকা। অথচ এই আমেরিকার দ্বারাই সবথেকে বেশি মানবাধীকার লঙ্ঘন হয়। কারণ গণতন্ত্রই হোল মানবাধীকার লঙ্ঘনের সবথেকে বড় হাতিয়ার। গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করেই আমেরিকা বছরের পর বছর মুসলিম বিশ্বে চালিয়েছে নির্যাতনের ষ্ট্রীম রোলার। যেমন,

জর্জ বুশের কারণে ইরাকে ৫০,০০০ শিশু মারা গেছে। এবং ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজ বলেছেন, "পৃথিবীর্ সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ।" ইংল্যান্ডের সাংসদ জর্জ গ্যালওয়ে বলেন, "জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার এই দুইজনের হাতে যত পরিমান রক্ত আছে তার চেয়ে অনেক কম মানুষের রক্ত রয়েছে লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণকারীদের হাতে।" তিনি আরও বলেন, "কোনও আত্মঘাতী হাম্লাকারী যদি ব্লেয়ারকে মেরে ফেলে এবং এতে যদি কোনও নিরীহ মানুষ মারা

যায় তাহলে এতে কোন অপরাধ হবে না।” পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যাতি বসু বলেন, “এক নম্বর সন্ত্রাসী হল বুশ।” নোবেলজয়ী বেটী উইলিয়াম বলেছেন, “বুশকে খুন করতে তার ভালোই লাগবে।”

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর মানবতা লঙ্ঘনঃ

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) পদ্ধতিগত নির্মম ও নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসাবাদ-কৌশল নিয়ে বড় বড় সংবাদের শিরোনাম সপ্তাহজুড়ে দেখেছে সারা বিশ্ব। ‘নাইন-ইলেভেনের’ হামলার পর বন্দি সন্দেহভাজন জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদে সিআইএ’র কৌশল ছিল অত্যান্ত ভয়ানক।

কী ছিলো সিআইএ’র কৌশল? কতটা নির্মম ছিলো তাদের নির্যাতন। গত মঙ্গলবার মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির প্রকাশ করা এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে জানা গেছে তার ভয়াবহতা। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের শাসনামলে ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত একটি কর্মসূচী চালু করে সিআইএ। এই কর্মসূচি অভ্যন্তরীণভাবে ‘রেনডিশন, ডিটেনশন অ্যান্ড ইন্টারোগেশন’ বলে অভিহিত ছিলো। এই কর্মসূচীর আওতায় সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদে ব্যবহার করা হতো নিষ্ঠুর পদ্ধত্তি।

সন্দেহভাজন আল-কায়েদা সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্য তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গোপন জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রগুলোতে রাখতো সিআইএ। তাদের জেরার সময় ঘুমোতে দেয়া হতো না। কোন কোন বন্দিকে ১৮০ ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমোতে দেয়া হয়নি। মুখে কাপড় চেপে ধরে পানি ঢালা হতো মৃত্যুর মতা কষ্ট অনুভব করনোর জন্য। বন্দিদের ভাঙ্গা পায়ের ওপর ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। তাদের রাখা হতো পুরোপুরি অন্ধকারে।

কখনো কখনো তাদের হাত মাথার উপর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। ঠাণ্ডা মেঝেতে নগ্ন করে বসিয়ে রাখা হতো। গালিগালাজ করা হতো অশ্রাব্য ভাষায়। বন্দিদের মলদ্বার দিয়ে জোর করে খাবার প্রবেশ করানো হতো। শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি বন্দিদের মানসিক নির্যাতনও করা হতো। ভয় দেখানো হতো 'লটারিতে যার নাম উঠবে তাকে মেরে ফেলা হবে' বলে। একজনকে যৌন নির্যাতন করা হয়, এমনকি বন্দিদের সন্তানদেরও হুমকি দেয়া হতো। ঠাণ্ডা মেঝেতে নগ্ন অবস্থায় জোর করে দীর্ঘ সময় বসিয়ে রাখায় এক বন্দি হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

২০০২ সালের এপ্রিলে সিআইএ বন্দিদের রাখার জন্য গোপন একটি কারাগার নির্মাণ করা হয়৷ যেটাকে 'ডিটেনশন সাইট কোবাল্ট' নামে ডাকা হতো। ওই কারাগারটি ঠিক কোথায় ছিলো তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ওই কারাগারে ২০টি কক্ষ ছিলো যেগুলোতে কোন জানালা ছিলো না। বন্দিদের পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা হতো। ঘন অন্ধকারে একাকী বন্দিকে দীর্ঘ সময় ধরে শেকল দিয়ে হাত মাথার উপর বেঁধে প্রচণ্ড জোরে গান ছেড়ে রাখা হতো। মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য ওই কক্ষে একটি ঝুড়ি ছাড়া আর কিছু দেয়া হতো না। এ ধরনের নির্যাতন অনেককে সারাজীবনের জন্য অসুস্থ করে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নাইন-ইলেভেন সন্ত্রাসী হামলার পর তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সন্দেহভাজন আল-কায়েদা সদস্যদের আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন। যদিও ২০০৬ সালের এপ্রিলের আগ পর্যন্ত সিআইএ'র কোন কর্মকর্তা তাদের এই নিষ্ঠুর জেরা প্রক্রিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে কিছু জানাননি। এমনকি হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিরাও সিআইএ'র নির্যাতনের ব্যাপারে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরের আগে কিছু জানতে পারেনি। পরবর্তীতে বারাক ওবামা ২০০৯ সালে এই কর্মসূচী বন্ধ করে দেন। তবে বুশের সময়কার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি গত বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাত্কারে দাবি করেন, সিআইএর জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল সম্পর্কে সব কিছুই জানতেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। আর বুশ নিজেও সিআইএকে সমর্থন করেছেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে।

এসব তথ্য প্রকাশের পর সিআইএ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি বিশ্ববিবেক নাড়া দিয়েছে। তবে তথ্য প্রকাশের পর আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন গোয়েন্দা সংস্থাটির পরিচালক। টেলিভিশনে দেয়া এক সাক্ষাত্কারে সিআইএ'র পরিচালক জন ব্রেনান স্বীকার করেছেন যে আটকদের জিজ্ঞাসাবাদের কিছু পদ্ধতি জঘন্য ছিল। এই স্বীকারোক্তির পর সিআইএ বস আরো বেকায়দায় পড়ে গেছেন। গোটা বিশ্ব থেকে তো বটে, নিজ দেশ থেকেও চরম সমালোচনার মুখোমুখি তিনি। তাদের অভিমত, সিআইএ একই কায়দায় সব সময় নির্যাতন চালিয়ে থাকে। তবে হামলা প্রতিহত করতে ও মানুষের জীবন রক্ষায় জিজ্ঞাসাবাদের মূল্যবান তথ্য কাজে এসেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে সিআইএ প্রধানের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন সিনেটের সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ডায়ানে ফেইনস্টেইন। তার মতে, নির্যাতনের এসব কৌশল কোন কাজে লাগেনি। বরং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে। আর প্রেসিডেন্ট ওবামা এক বিবৃতিতে বলেছেন, তার মেয়াদে জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল আর ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। প্রতিবেদন প্রকাশের পর বর্বরোচিত এই নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত মার্কিন প্রশাসন ও সিআইএ কর্মকর্তাদের বিচার দাবি করেছে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন।

জেনেভা থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ দূত বেন এমারসন বলেছেন, জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের যেসব জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ নির্যাতনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্যাতনের ঘটনায় কেবল সিআইএ নয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকারও দায়ী। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র দায়ীদের বিচার করতে বাধ্য। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক কেনেথ রোথ বলেছেন, সিআইএ'র এই ঘটনা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এটি কোনভাবেই ন্যায্যতা পেতে পারে না।

আল জাজিরার অনলাইলে প্রকাশিত এক মন্তব্যে বলা হয়, এসব সন্দেহভাজন জঙ্গিদের মানব গিনিপিগে পরিণত করা হয়েছে। সিআইএ'র নির্যাতন মানুষের মৌলিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অপরাধ। মোট ছয় হাজার ৭শ' পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে ১১৯ সন্দেহভাজনকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আশা করছে, মূল প্রতিবেদনটি দ্রুত প্রকাশ করা হবে। একইসঙ্গে সিনেট কমিটির উচিত হবে মার্কিন মানবাধিকার ও নির্যাতনের অপরাধের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা।

এখন পর্যন্ত কাউকে নির্যাতনের অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি। এমনকি দায়ীদের বিচারের বিষয়ে কোন অঙ্গীকারও করা হয়নি। এই জবাবদিহিতার শূন্যতা যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইনের উল্টোপথে নিয়ে গেছে। অতীতে ও বর্তমানে প্রশাসন ও এজেন্সির যে পদেই দায়ীরা থাকুন কেন তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে সিআইএ'র অপরাধ সংগঠনে অন্য কোন দেশ সহায়তা করলে তাদেরকেও বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। গত ১০ ডিসেম্বর ছিলো 'কনভেনশন এগেইনিস্ট টর্চার' গৃহিত হওয়ার ৩০তম বার্ষিকী। ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি অনুসমর্থন করে। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ওবামার উচিত দায়ীদের দায়মুক্তি না দেয়ার ঘোষণা দেয়া। একইসঙ্গে ভিকটিমদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত যাতে করে তারা ট্রমা (মানসিক আঘাতের ফলে সৃষ্ট স্নায়ুরোগ) কাটিয়ে উঠতে পারে। সন্দেহভাজনরা যদি অপরাধী হয় তবে তাদেরকে অবশ্যই বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এসব ভিকটিম ন্যায় বিচার পাওয়ারও দাবি রাখে।

আমেরিকার এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা সম্ভব হয়েছিল কারণ তাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে আব্রাহাম নিঙ্কনের তথাকথিত গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে প্রয়োগ করেই তারা এসব করতে পেরেছিল। আর আমেরিকা এজন্যই চায় সারা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক যাতে সারা বিশ্বে তারা একচেটিয়া আধিপত্ব বিস্তার করতে পারে।

পরিশিষ্ট

তাহলে এতক্ষন আলোচনার মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেল যে গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এখন প্রশ্ন হল গণতন্ত্র যদি কুফরী মতবাদ হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু ইসলামিক সংগঠন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কেন? এর উত্তর হল, কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বৈধ। যেমন এ বিষয়ে সৌদি আরবের বিখ্যাত গ্র্যান্ড মুফতী আল্লামা ইবনে বায (রহঃ) ও ইবনে উসাইমিন (রহঃ) বলেন, গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে শিরক। এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কাফির। তবে যদি ইসলামী বিধি প্রবর্তনের ক্ষমতা থাকে বা নিজে না গেলে কোন খারাপ লোক সেখানে যাবে-এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায়। ইবনে উসাইমিন একটু বাড়িয়ে বলেছেন, বরং এমতাবস্থায় তা (নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা) ওয়াজীব। একই সাথে তাঁরা বলেছেন, দলপরস্তি নিষেধ।

অর্থাৎ এর সারমর্ম হল, যদি কোন ইসলামবিরোধী দল ক্ষমতায় এসে ইসলামের ক্ষতির আশংকা থাকে বা কোন অপদার্থ লোক ক্ষমতায় এলে দেশের সামাজিক পরিবেশ বিঘ্ন হবার আশংকা থাকে তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের মুকাবিলা করা ওয়াজীব। কেননা ইসলাম কোনদিন অন্যায় বরদাস্ত করে না। তাই অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইসলামবিরোধীদের উৎখাত করা অবশ্য কর্তব্য। এটা কেবল সেই দেশের জন্য প্রযোজ্য যেখানে গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে কায়েম হয়ে গেছে। যেখানে খেলাফতের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে মনে প্রাণে গণতন্ত্রকে ঘৃণা করতে হবে এবং খেলাফত কায়েমের জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে যতক্ষন না পর্যন্ত আল্লাহর জমীনে খেলাফত কায়েম হয় এবং সমস্ত ত্বাগুতি শক্তির বিনাশ হয়। এটা না করলে আমাদের ধ্বংশ অনিবার্য।

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১) তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে (অনলাইন/অফলাইন) ৩০/-
২) ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে? (অনলাইন/অফলাইন) ১৫/-
৩) এরা আহলে হাদীস না শিয়া? (অনলাইন/অফলাইন) ২০/-
৪) ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলীদ
(আহলে হাদীস ফিৎনার নতুন রুপ) অফলাইন) ৬০/-
৫) আল কালামুস শরীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমান) (অনলাইন/অফলাইন) ৭০/-
৬) ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৭) আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় (অনলাইন) ৪০/-
৮) তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান (অনলাইন) ৩৫/-
৯) সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন? (প্রকাশিতব্য) ----
১০) ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ (প্রকাশিতব্য) ----
১১) আমরা সবাই মৌলবাদী (প্রকাশিতব্য) ----
১২) কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা (অনলাইন) ৩০/-
১৩) আমরা সবাই তালিবান (প্রকাশিতব্য) ----
১৪) রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ? (প্রকাশিতব্য) ----
১৫) মুহাররাম মাসে তাজিয়াবাজী (অনলাইন) ২০/-
১৬) মাসআলা আমীন বিল জেহের (অনলাইন) ২০/-
১৭) সুন্নতে রাসুলে আকরাম ফি কিরাআত খলফল ইমাম
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য) ----
১৮) সুন্নতে রাসুলুস সাকইল ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন (অনলাইন) ৫০/-
১৯) তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত (প্রকাশিতব্য) ----
২০) গুমরাহীর নায়ক ডাঃ জাকির নায়েক (প্রকাশিতব্য) ----
২১) আকিদা হায়াতুন নবী (সাঃ) (অনলাইন) ৩০/-
২২) বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অনলাইন) ৩০/-
২৩) আসুন আমরা সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলিকে খতম করি (অনলাইন) ২০০/-
২৪) আমিরুল মোমেনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ (অনলাইন) ৪০/-
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য) ----
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য) ----

২৭) নাস্তিক্যবাদ নিপাত যাক (অনলাইন) ৫০/-
২৮) তথাকথিত নাস্তিক প্রবীর ঘোষের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
২৯) নাস্তিকতাবাদীদের কফিনে শেষ পেরেক (প্রকাশিতব্য) ----
৩০) যুক্তিবাদীদের যুক্তি খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩১) নাস্তিকের অপবাদ খন্ডন (প্রকাশিতব্য) ----
৩২) প্রবীর ঘোষকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৩) তসলিমা নাসরিনকে অপেন চ্যালেঞ্জ (অনলাইন) ১০/-
৩৪) নাস্তিক অভিজিৎ রায়ের অপবাদ খন্ডন (অনলাইন) ৫০/-
৩৫) হিন্দুধর্মে গো-মাংস খাওয়ার প্রমান (অনলাইন) ১০/
৩৬) তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটি আলাদা নামায (অনলাইন) ২৫/-
৩৭) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস আইএস ইসরাইলের সৃষ্টি (অনলাইন) ৬০/-
৩৮) মুজাহিদ নারী ডাঃ আফিয়া সিদ্দিকী (অনলাইন) ৩০/-
৩৯) গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ (অনলাইন) ৮০/-
৪০) রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ১৫-
৪১) ভারতে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) সন্ত্রাস ও মুসলমান (অনলাইন) ২০/-
৪২) 'আমীন প্রসঙ্গে মিথ্যাচারের জবাব' এর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৪০/-
৪৩) নাসীরুদ্দীন আলবানীকে নিয়ে আহলে হাদীসদের বাড়াবাড়ি (অনলাইন) ৪০/-
৪৪) হাদীস গবেষনায় লা মাযহাবী জুবাইর আলী যাই এর জালিয়াতি (অনলাইন) ৩৫/-
৪৫) লা মাযহাবী আনওয়ারুল হক ফাইযীর পোষ্ট মর্টেম (অনলাইন) ৩০/-
৪৬) ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস ও বেরেলী ফিৎনার আবির্ভাব (প্রথম প্রকাশ - ২০১০ ফেব্রুয়ারী, বর্তমানে বাজেয়াপ্ত) ৩০/-
৪৭) নামাযে হাত বাঁধা নিয়ে আনওয়ারুল হক ফাইযীর মিথ্যাচারের জবাব (অনলাইন) ৩০/-
৪৮) রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীসের বিরুদ্ধ আনওয়ারুল হক ফাইযীর অপবাদ খণ্ডন (অনলাইন) ৩০
৪৯) নামাযে নারী পুরুষের নামাযে পার্থক্য (অনলাইন) ৩৫/-
৫০) মৌদুদী মতবাদের স্বরুপ উন্মোচন (অনলাইন) ৩০/-
৫১) আল কুরআনের আমোঘ ঘোষণা নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করা যাবেনা (অনলাইন) ২০/-
৫২) আহলে হাদীসদের নিকটে ১০০টি প্রশ্ন (অনলাইন) ২০/-
৫৩) মানবতার শত্রু আমেরিকা (অনলাইন) ১০/-
৫৪) মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) [অনলাইন] ৮০/-

অনুদিত পুস্তক

১) হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ হুজ্জাতুল্লাহফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহঃ)] ----
২) আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাথে মতবিরোধ। (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখকঃ আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহঃ)] ----
৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ। (মূল হিন্দী লেখকঃ ডঃ এইচ এ শ্রীবাস্তব/ অনলাইন) ৩০/-
৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দী লেখকঃ ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] ৩০/-